টেক্‌স্‌ট্‌বুক কমিটীর অনুমত ম্যাট্রিকিউলেশন্‌ পরীক্ষার্থ মাননীয় ভাইস্‌ চ্যান্‌সেলার ও সিণ্ডিকেট্‌ কর্ত্তৃক অনুমোদিত

বঙ্গের রত্নমালা।

বা

বঙ্গীয় সমাজের কতিপয় নীতিগর্ভ ঘটনা ও চরিত্র।

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক

পণ্ডিত

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

১৩২১।

মূল্য বার আনা।

PRINTED BY G. C. NEOGI
NABABIBHAKAR PRESS
91-2, Machua Bazar Street, Calcutta

PUBLISHED BY

T. S BANERJEE P. G Sanial.
of T. S. BANERJEE & Co..
26, SHAMPOOR STREET CALCUTTA.

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

৺উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মধ্যমাগ্রজ মহোদয় শ্রীচরণেষু—

দাদা, দশ বৎসর হইল আপনি এই অনুজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুণ্যক্ষেত্র ৺কাশীধামে যাত্রা করিলেন, ও সেই মহাতীর্থ গিরিজা-পতিনগরীতে স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের নিকট হইতে তারকমন্ত্রলাভে অমলাত্মা হইয়া অমৃতধামে গমন করিলেন। আপনি যতদিন ৺কাশীধামে বাস করেন, সমুপাগত আত্মীয় স্বজনের নিকট কেবল আমারই মঙ্গল সংবাদ লইতেন, আমারই কথা তাঁহাদের কাছে উল্লেখ করিতেন, আপনার যে তিন পুত্র আমার নিকট ছিল তাহাদের সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। আমি যে আপনার কি ধন ছিলাম তাহা জানিতে কাহারও বাকী ছিল না। বাল্যকালে যখন বিদ্যাশিক্ষার্থ আপনাকে ও মাতা পিতাকে ছাড়িয়া পাঁচ বৎসর দূরস্থানে অবস্থান করিয়াছি, তখন বৎসরে একবার করিয়া পিতাঠাকুর অত দূরদেশ হইতে হাঁটিয়া আসিয়া আমাকে দর্শন দিতেন; আপনি ও স্নেহময়ী জননী কেবল পত্রার্থে আমার কুশল সংবাদ অবগত হইয়াই অতি কষ্টে দিন কাটাইতেন। বাবার মুখে শুনিতাম, আমার পত্র যাইতে বিলম্ব হইলে তাঁহারা আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। পাছে কোনও অমঙ্গল সংবাদ শুনিতে হয় সেই ভয়ে আপনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেন। তখন আপনার কতই বা বয়স! অত অল্প বয়স হইতেই যে স্নেহ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ হইলে প্রাণ কেমনই করিয়া উঠে!

মা একদিন বলিলেন, "তোর মেজ দাদা পীড়াদি জন্য সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে অসমর্থ হইলে, তাহার আহ্নিক বাদ যায়, কিন্তু তোর মঙ্গলের জন্য প্রতিদিন যে সহস্র দুর্গানাম জপ করে তাহা কখনই বাদ যায় না।" দাদা, তুমি যে প্রাণের সহিত দুর্গানাম জপ করিতে, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে। তুমি সেই জগন্মাতার নাম জপ করিয়া আমার মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন না করিলে আমার জীবন এত সুখময় হইত না।

ভক্তির উচ্ছ্বাসে আপনাকে যখনই যে দ্রব্য দিয়াছি তাহা গ্রহণ করিতে কি আনন্দই প্রকাশ করিতেন! আজ আপনার সেই সাধের ধন অনুজ বঙ্গের রত্নমালার দ্বিতীয়ভাগ আপনার উদ্দেশে উৎসর্গ করিবার জন্য দণ্ডায়মান। আপনি অমৃতধাম হইতে এই ক্ষুদ্র উপহারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই, সমস্ত শ্রম সফল হইবে।

সেবক

ডিসেম্বর ১৯১২। অপ্রতিম-স্নেহের অনুজ

কালীকৃষ্ণ

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গের রত্নমালা দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। প্রথম ভাগের ন্যায় দ্বিতীয় ভাগেও কেবল বঙ্গবাসীদিগেরই যে সব চরিত রত্নভূত, সুতরাং যাহার অনুকরণে বালকদিগের দোষের পরিহার ও গুণে অনুরাগ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল ঘটনা নানা স্থান হইতে সঙ্কলিত করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উপরিতন শ্রেণীর বালকদিগের উপযোগি করিবার জন্য ইহার ভাষা মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রগাঢ় করা হইয়াছে।

শ্বেতবর্ণের উৎকর্ষ দেখাইতে হইলে যেমন তাহার পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ প্রক্ষেপ করিতে হয়, রামচন্দ্রের অমানুষ চরিত্র বর্ণন করিতে হইলে যেমন পাপাত্মা রাবণের দুশ্চরিত্রতা বর্ণন করিতে হয়, সেইরূপ রত্নমালার চরিত্র বিশেষের উৎকর্ষ বর্ণনা করিবার জন্য তাহার পার্শ্বে অপকৃষ্ট চরিত্রের বর্ণন করিতে হইয়াছে। এ সকল চরিত্র রত্নমালার যোগ্য না হইলেও প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যেই বর্ণিত হইয়াছে। যাহাদের জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের সম্পৃক্ত সমুদয় মনোভাব বা ধর্ম্মভাব সকলের মনোবৃত্তির অনুযায়ী না হইলেও সত্যের খাতিরে বলিতে হইয়াছে। সত্য ঘটনা না হইলে মনে অঙ্কিত হয় না বলিয়া সত্যের দিকেই লক্ষ্য রাখাতে অনেক স্থলে বিরূপতা বা রুচির বিরুদ্ধতা হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সত্যের অমান্য করা হয় নাই। তবে ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য স্থানবিশেষে ভাষা রঞ্জিত করিতে হইয়াছে। এক্ষণে পণ্ডিত মহোদয়গণের নিকট সানুনয় অনুরোধ, তাঁহারা এই পুস্তকখানিকে অধিকতর উপযোগি করিবার জন্য যে সকল দোষ দেখিতে পাইবেন তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

গ্রন্থকারস্য।

সূচীপত্র।

বিষয় | পৃষ্ঠ

বঙ্গের রত্নমালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

অনুক্রমণিকা।

একটী বটবৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার বিশালতা, তাহার পদ্মরাগমণিখচিত গারুড়মণির শোভা, তাহার শীতল ছায়ায় পথিকগণের অশেষ পরিতৃপ্তি, তাহাতে আশ্রিত অসংখ্য পক্ষীর বটফলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হেতু মধুর কূজিত ইত্যাদিতে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এমন সুন্দর বটবৃক্ষ কোথা হইতে আসিল ? ইহা আসিল একটী সর্ষপসদৃশ ক্ষুদ্র বীজ হইতে। সর্ষপসদৃশ ক্ষুদ্র বীজে এত বৃহৎ মহোপকারক পদার্থের আবির্ভাব কিরূপে হইল ? ইহার উত্তর—বীজের সূক্ষ্মতায় কিছুই আসে যায় না ; দেখিতে হইবে, ইহার সারবত্তা কিরূপ। সূক্ষ্মতা বৃহত্তরতা অনুসারে মহানের উৎপত্তি হয় না, সারবত্তা অনুসারেই হয়।

একটী কপিথ গজভুক্ত হইলে তাহা শূন্যগর্ভ অসার হয়। সেই গজভুক্ত কপিত্থের কোন কালেই অঙ্কুরোদ্গম হয় না। তাহা রোপণ করিলে অল্পদিন মধ্যে মৃত্তিকাতে বিলীন হয়। কিন্তু বটবৃক্ষের বীজ আকারে ক্ষুদ্রতর হইতে ক্ষুদ্রতম হইলে কি হইবে, ইহার সারের তুলনা নাই। ইহা গজভুক্তই হউক আর পক্ষীর দারুণ জঠরাগ্নিতে পচ্যমানই হউক ইহার সারবত্তার অপগম হইবার নহে। পক্ষীর জঠর হইতে বিসৃষ্ট বটবীজ ইষ্টকাচিত সৌধেই পতিত হউক, আর পাষাণেই পতিত হউক, তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইবে, তাহার বিটপসজ্ঘ চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিবে, তাহা ফল পত্রে সুশোভিত হইয়া সকলের চক্ষুর তৃপ্তি বিধান করিবে।

জঠরাগ্নির প্রবলতা, ইষ্টক বা পাষাণের কর্কশতা, কোন বিঘ্নই, তাহার উন্নতির ব্যাঘাত দিতে পারে না।

যখন সারবত্তাই বিস্তীর্ণতা, সুশোভা ও ফলপত্রোদ্গমের মূল হইল, তখন সকলেরই সারবত্তার দিকেই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আত্মা যতই ক্ষুদ্র হউক, যতই ক্ষুদ্রবংশ-সম্ভূত হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না, দেখিতে হইবে তাহাতে সারবত্তা কতদূর। যেখানেই সারবত্তা সেই খানেই আশা ভরসা। অন্যথা, আত্মা যত বড়ই হউক, যত বড়বংশ হইতেই সমদ্ভূত হউক, তাহা সারবান্ না হইলে তাহার উন্নতিরও আশা নাই, তাহার মনোমুগ্ধকারিত্বের আশা নাই, তাহার জীবন সাফল্যেরও কোনও ভরসা নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আত্মার সারবত্তা কিরূপে হয়? প্রথম, সত্যপ্রিয়তা; দ্বিতীয়, উদ্যম; তৃতীয়, স্নেহভক্তি; চতুর্থ, পরানুকূলতা; এবং পঞ্চম, অনাকুলতা অর্থাৎ নির্ভীকতা; এই কয়টীর নির্ম্মলতায় আত্মার সারবত্তা হয়। মনুষ্যের দেহ যেমন পঞ্চভূতের উৎকর্ষে সারবান্ হয়, মনুষ্যের আত্মাও সেইরূপ ঐ পঞ্চের উৎকর্ষে সসার হয়। পঞ্চভূতের অন্যতম জল পূতিগন্ধি হইলে সেই জলপানে যে দেহ সারহীন হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ নির্ভীকতা স্বার্থপরতায় কলুষিত হইলে, সে নির্ভীকতায় আত্মার সারবত্তা হয় না। কর্পূরবাসিত জল যেমন স্বাস্থ্য বিধান করে, উপচিকীর্ষা মিশ্রিত নির্ভীকতা সেইরূপ আত্মার সারবত্তা সম্পাদন করে। সত্যপ্রিয়তার সহিত নিস্মমতা থাকিলে সে সত্যপ্রিয়তা পূতিগন্ধি জলের ন্যায় আত্মার অসারতা উৎপাদন করে। সেইরূপ, উদ্যম আত্মার উন্নতির প্রধান সামগ্রী হইলেও, যদি তাহা নিকৃষ্ট ভাবের সহিত মিশ্রিত থাকে অর্থাৎ উদ্যম মন্দ বিষয়ে যদি পতিত হয়, তাহাতে আত্মার সারবত্তার কথা দূরে থাকুক, আত্মার অধোগতি হয়। সেইরূপ আবার, স্নেহভক্তির সহিত পক্ষপাতিতার যোগ হইলে তাহাতে মানুষের আত্মার

অধঃপাত হইতে থাকে। আবার পরানুকূলতায় নীচতা আসিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

মহাভারতের উপন্যাসে এক মুনিকে কয়েকটী দস্যু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দেব, আপনি বলিতে পারেন, এক পথিক স্বোপার্জিত বহু অর্থ লইয়া কোন্ পথে গেল? আপনি মিথ্যা কহিতে জানেন না বলিয়াই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। মুনি বুঝিলেন ইহারা দস্যু, ইহারা পথিকের পথ জানিতে পারিলেই পথিকের প্রাণসংহার করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে। কিন্তু কি করিবেন তিনি সত্যের খাতিরে পথিকের পথ বলিয়া দিলেন ও মরণান্তে নরকে গমন করিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, মুনি যখন নরকে যাইলেন, তখন কি তিনি সত্য বলিয়া অপরাধী হইয়াছেন? তাঁহার কি মিথ্যা কথা বলা উচিত ছিল? ইহার উত্তরে বলিতে হয়, মুনির সত্যপ্রিয়তার সহিত নির্ম্মমতা ছিল, পথিকের জন্য মমতা ছিল না, সুতরাং তাঁহার অপরাধের সীমা নাই। মিথ্যাকথা ভিন্ন পথিককে রক্ষা করিবার তাঁহার কি আর অন্য উপায় ছিল না? তিনি আত্মার প্রধান সারবত্তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। সম্পূর্ণ নির্ভীকতা প্রদর্শন করিয়া বলা উচিত ছিল; "আমি পথিকের পথ জানি, কিন্তু কিছুতেই বলিব না। শাণিতাস্ত্রের ভয়ে আমি পথিকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিব না। মানুষত অমর নয়, তবে তোমাদের হাতে মরণের ভয়ে পথিকের সর্ব্বনাশ কেন করিব?"

এই উপন্যাসে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, মমতামিশ্রিত সত্যপ্রিয়তাই আত্মার সারবত্তার একটী প্রধান উপাদান। মমতাশূন্য সত্যপ্রিয়তা অবনতির মূল। "আমি বাপু স্পষ্টবাদী, আমার কাছে ঢাক ঢাক গুড় গুড় নাই, ইহাতে তিনি দুঃখ পান নাচার" ইত্যাদি বলিয়া যাঁহারা বড়াই করেন, তাঁহাদের আত্মা যে সম্পূর্ণ সারবত্তাহীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মমতামিশ্রিত সত্যপ্রিয়তা যেখানে, অনভিমানিতা সেখানে। অভিমান

মানুষের প্রধান শত্রু। সত্যপ্রিয়তা থাকিলে সেই দারুণ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

পরানুকূলতা যেখানে, স্বার্থহীনতা সেখানে, কার্কশ্যহীনতা সেখানে, অনভিমানিতা সেখানে। এইরূপে উপরিউক্ত পঞ্চগুণের বিষয় যতই আলোচনা করিবে ততই বিবিধ সত্য আবিষ্কৃত হইবে। এই ক্ষুদ্র অনুক্রমণিকায় একটী গুণের এক দেশ মাত্র প্রদর্শিত হইল। পিতা মাতা ও শিক্ষকগণ এই পুস্তকে বর্ণিত ঘটনানিচয়ে অন্যান্য গুণগরিমা প্রদর্শন করিবেন। উপরি উক্ত পঞ্চগুণের উৎকর্ষ দ্বারা যাহাতে বালকের আত্মার শ্রীবৃদ্ধি হয় সেই জন্যই বঙ্গের রত্নমালার প্রথম ভাগের সৃষ্টি। এই একই উদ্দেশ্য সাধনের আশায় বঙ্গের রত্নমালার দ্বিতীয় ভাগের আবির্ভাব হইল। ভগবান্ বালকের আত্মার উন্নতির ভার পিতা মাতা ও শিক্ষকেরই হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। বঙ্গের রত্নমালা যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচায়ক প্রকৃত ঘটনাগুলি তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াই ক্ষান্ত। সেই চিত্রগুলি স্পষ্টরূপে বালকদিগের চিত্তমুকুরে প্রতিফলিত করা পিতা মাতা ও শিক্ষকেরই কাজ। মনুষ্যের স্বভাব, সে অপ্রকৃত উপন্যাসাদি শুনিয়া মুগ্ধ হইবার নয়, তাহার সম্মুখে যতক্ষণ সত্য ঘটনা না উপস্থাপিত করিবে ততক্ষণ সে তাহা অনুকরণের যোগ্য মনে করিবে না। সেই জন্য সত্য ঘটনা গুলির সমাবেশে বঙ্গের রত্নমালার দ্বিতীয় ভাগও তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপিত হইল। আশা, বঙ্গীয় পিতা মাতা ও শিক্ষকগণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সহায়তায় তাঁহাদের আশ্রিত বালকবালিকাদিগের পঞ্চগুণের বিকাশ দ্বারা তাঁহাদের আত্মাকে সমুন্নত করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য বোধ করিবেন।

ক্রোধহীনতা।

অপকারিণি চেৎ ক্রোধঃ, ক্রোধঃ ক্রোধে কথং ন তে।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং চতুর্ণাং পরিপন্থিনি॥

যদি কেহ অপকার করিলেই তোমার ক্রোধ হয়, তবে ক্রোধের প্রতি তোমার ক্রোধোদয় হয় না কেন? ক্রোধের ন্যায় অপকারক আর কেহই নাই, কারণ, ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সমুদায়কেই নিহত করে।

১। একদিন একটী জমিদারের বহির্বাটিতে চন্দ্রাতপের নীচে যাত্রা হইতেছিল। যাত্রাটী বেশ জমিয়াছিল। লোকে লোকারণ্য। বসিবার স্থান পূর্ণ হওয়াতে অনেকে দাঁড়াইয়া যাত্রা শুনিতেছিল। জমিদারের ভৃত্যও তাহার মনিবের একটী শিশু সন্তান কোলে লইয়া জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া যাত্রা শুনিতেছিল। ভৃত্য মগ্নচিত্ত হইয়া যাত্রা শুনিতেছে, এমন সময়ে আর একটী ভৃত্য শিশুকে স্তন্যপানার্থ লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইল এবং শিশুকে লইয়া হঠাৎ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছেলের হাতে সোণার বালা ছিল, কি হইল?

প্রথম ভৃত্যটী বালকের হস্ত বলয়শূন্য দেখিয়াই ক্রোধভরে একটী লোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, এই বদমায়েস ছেলের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, নিশ্চয়ই এই দুরাত্মা বালা লইয়াছে। এই বলিবামাত্র দুই ভৃত্যই তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল। তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তি ভাবিল, যদি ভৃত্যগণ আমাকে এই স্থানেই প্রহার করে তাহা হইলে যাত্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে, সুতরাং এস্থান ত্যাগ করিয়া দূরে গমন করি, এই ভাবিয়া ভৃত্যদিগকে বিনয়বাক্যে বুঝাইতে লাগিল, "ভাই সকল, আমি জমিদারের ছেলের কি বালা লইতে পারি? জমিদার আমাদের পিতৃতুল্য, এই বালক আমার ছোট ভাই, আমি কি ছোট ভাইয়ের বালা লইতে পারি?" অপরিচিত ব্যক্তি এইরূপ বিনয়বাক্য বলিতে বলিতে অল্পে

অল্পে দূরে গমন করিতে লাগিল। ভৃত্যদ্বয় মনে করিল বালাচোর এইরূপে পাশ কাটাইতেছে; ভাবিয়া একজন বাটীর গমস্তাকে সংবাদ দিল। গমস্তা ছুটিয়া আসিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়াই কেবল প্রহার করিতে লাগিল। অপরিচিত ব্যক্তির গায়ে যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল, চারি পাঁচ জনকে ভাগাইবার ক্ষমতা সত্ত্বেও সে প্রহার যাতনা সহ্য করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, "বাবু, নিরীহকে মারিয়া কি লাভ হইবে?"

এক ব্যক্তি বালা চুরি করিয়া পলাইতেছে, গমস্তা মহাশয় তাহাকে প্রহার করিতেছে এই বার্ত্তা চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল। বাটীর কর্ত্তারও কাণে এই কথা উঠিতে বিলম্ব হইল না; কর্ত্তা শুনিতে পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন এবং "নিরীহকে মারিও না" বলিয়া গমস্তার হাত ধরিয়া বলিলেন, "খোকার হাতের বালা আমি খুলিয়া রাখিয়াছি, উহার বালা চুরি যায় নাই।" পরে ভৃত্যের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমি খুলিয়া লইবার সময় তোমাকেও জানাইয়াছিলাম, তুমি গানে মগ্ন হইয়া তাহা শুনিতে পাও নাই? আহা নিরীহকে এত কষ্ট দিয়াছ?" বলিয়া সাশ্রুনয়নে তাহার অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন ও নিজের বস্ত্রে তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। পরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভদ্র, তোমার দেহ যেরূপ বলিষ্ঠ দেখিতেছি তাহাতে তুমি ইহাদিগকে প্রহার করিতে দিলে কেন? তুমি মনে করিলে এরূপ দশটা লোক একাই নিহত করিতে পার।" গমস্তা জড় সড় হইয়া আত্ম অপরাধ বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত কাতর হইল, এবং অপরিচিতের পদদ্বয় ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল। তখন সেই আহত ব্যক্তি করযোড়ে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আপনি যে জিনিস হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা হইতে আপনাকে বহুদিন কাঁদিতে হইবে। যে ব্যক্তি ক্রোধের আশ্রয় লইয়াছে তাহার কোন্ দিন ভাল গিয়াছে? অপকারীর প্রতি যদি আপনার এতই ক্রোধ হয়, তবে ক্রোধের প্রতি আপনার ক্রোধ হওয়া

উচিত। কারণ, ক্রোধ যত সর্ব্বনাশ করে, তেমন কোন শত্রুই পারে না। আমি মহাজনের মুখে ক্রোধের নিন্দা শুনিয়া তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি, অন্যথা আপনাদের দশ জনেরও সাধ্য নাই যে আমার নিকট অগ্রসর হন।"

অপরিচিতের মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার প্রতি সকলেরই কেমন একটা ভক্তির ভাব আসিল। জমিদার তাহাকে যত্ন করিয়া যাত্রার স্থানে নিজের আসনের নিকট এক তাকিয়া দিয়া তাহাকে বসাইয়া যাত্রা শুনাইতে লাগিলেন ও যাত্রা ভাঙ্গিলে নিজের আলয়ে লইয়া গিয়া স্বহস্তে অতিথিপূজা করিতে লাগিলেন। গমস্তা তাহার প্রহৃত স্থান তৈল দিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিল ও অশ্রুজলে আত্মকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

২। কলিকাতা সিটিকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়কে কেহ কখন ক্রোধ করিতে দেখে নাই। অনেকের ধারণা আছে, ক্রোধ না করিলে অনেক সময়ে কার্য্যসিদ্ধি হয় না; ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে সকলেই ভয় করে সুতরাং তাহার ভয়ে কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করে; ভয় না থাকিলে অনেকে কার্য্যে ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। ভয়ে কার্য্য সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু সকল সময়ে সুসম্পন্ন হইবার কথা নয়। প্রীতির সহিত কার্য্য সম্পন্ন করা এক পদার্থ, আর ভয়ে ভয়ে কার্য্য করা অন্য পদার্থ। এ দুয়ে পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রথমে হরিনাভি ইং সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। সে বিদ্যালয়ে বালকগণ দুরন্ত ছিল না সুতরাং তাহা শাসন করিতে তাঁহার কখনই ক্রোধের প্রয়োজনীয়তা হয় নাই। কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি কোন্নগর ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন। তখন কোন্নগর বিদ্যালয় দুরন্ত বালকের আড্ডা বলিয়া গণনীয় ছিল। সুতরাং সে সকল বালক-দিগকে বিনা ক্রোধে কিরূপে শাসন করিবেন তাহা জানিবার জন্য হরিনাভি

বিত্থালয়ের কয়েকটী ছাত্রের কৌতূহল জন্মিল। তাহারা, কোন্নগর বিত্থালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখে বিত্থালয় একেবারেই সুশাসিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিতে লাগিল, 'প্রধান শিক্ষক বাবু উমেশচন্দ্র মানুষ নহেন, ইনি দেবতা। যে বালক দুষ্টতা প্রকাশ করিত, উমেশ বাবু তাহার দিকে এমন প্রশান্ত ভাবে চাহিয়া থাকিতেন যে, সে বালক তাঁহার দৃষ্টিপাতে কেমন জড়ীভূত হইয়া পড়িত, সুতরাং দ্বিতীয়বার আর তাহার মনে দুষ্টতা আসিত না।'

৩। পুরুলিয়া গবর্ণমেণ্টের উচ্চ ইংরাজি বিত্থালয়ের তৃতীয় শিক্ষক, উক্ত বিত্থালয়-সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কখনই ক্রোধ করিতে দেখে নাই। কি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, কি ছাত্রাবাসের ছাত্র সকলেই তাঁহার এমন বাধ্য ছিল যে, সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাহা দেখিয়া অবাক্ হইতেন। তাঁহার দুইটী পুত্র উক্ত বিত্থালয়ে পাঠ করিত ও ঐ ছাত্রাবাসে পিতার সহিত অবস্থান করিত। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিতেন, ঐ বালক দুইটী যেমন পড়া শুনায় উৎকৃষ্ট সেইরূপ পিতার গুণে এমন বশ্য যে, তাহাদিগকে যদি বলা যায়, আমরা যতক্ষণ না ফিরিতেছি তোমরা এই স্থানে দাঁড়াইয়া থাক, তবে আমরা সেই স্থানে আসিতে সমস্ত দিন ভুলিয়া থাকিলেও উহারা সেই স্থান হইতে নড়িবে না। ইহারা ক্যাসাবিয়াঙ্কাকেও হারাইয়া দেয়।

তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের অক্রোধতা অন্যান্য শিক্ষক ও তাঁহাদের আত্মীয়দিগের পত্নীদের কাণে উঠিল। একবার তৃতীয় শিক্ষকের পত্নী পুরুলিয়াতে আসেন। আত্মীয়দিগের পত্নীগণ তাঁহাকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার স্বামী কি কখন রাগ করেন না?" পত্নী উত্তর করিলেন "আমি কুড়ি বৎসর স্বামীর সহিত ঘর করিতেছি, কিন্তু কখনই জোরে কথা কহিতে শুনিলাম না; বরং আমি যদি কখনও ক্রুদ্ধ হই, উনি সেই স্থান হইতে সরিয়া যান ও আমার ক্রোধের অন্তে হাসিতে হাসিতে

ক্রোধহীনতা

উমেশচন্দ্র দত্ত

সাক্ষাৎ করেন ও আমাকে অপ্রস্তুত করিয়া ফেলেন। উহাঁর হেঁপায় পড়িয়া আমারও রাগ করা ঘটে না, পুত্রগণও ক্রোধশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগকে কেহ অবমান করিলে, তাহা অক্লেশেই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে।"

অভিমান ত্যাগ।

পঞ্চানন মিত্র।

"অভিমানং বিহায়ৈব মানুষো মানুষো ভবেৎ ॥"

অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই, মানুষ যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে।

কলিকাতা নিবাসী পঞ্চানন মিত্র অতি ধনবান্ লোক ছিলেন। তিনি একজন হৌসওয়ালা ছিলেন। তাঁহার কারবার যখন সুন্দর রূপে চলিতেছিল তখন তাঁহার সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। তাঁহার বাটীর আয়তন দেখিলে বুঝা যাইত, তিনি কত বড় ধনবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র ছিল। পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তিনি যথেষ্ট ব্যয় করেন। তাঁহার বাটীতে নিত্য উৎসব ছিল। লোক মধ্যে ধনবানের কথা উঠিলে অগ্রে পঞ্চানন মিত্রেরই নাম শ্রুত হইত।

ভাগ্যলক্ষ্মী সকলের নিকট সকল সময়ে অটল থাকেন না। ক্রমে পঞ্চানন মিত্রের দুর্দ্দিন দেখা দিতে লাগিল। সাত লক্ষ টাকার পণ্যসম্ভার লইয়া একখানি জাহাজ সমুদ্রের কোন্ স্থানে যে জলমগ্ন হইল তাহার কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না। আত্মীয় কুটুম্বগণ ক্রমে বিরোধী হইয়া পড়িলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপা পত্নী ও একমাত্র পুত্র জীবনলীলা সংবরণ করিলেন। ভৃত্যগণ লুট আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে এমন দেনদার হইয়া পড়িলেন যে পাওনাদারদিগের ভয়ে তাঁহাকে নিজগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিতে হইল।

এই সময়ে কষ্টের সীমা রহিল না। সোণা রূপার বাসন বেচিয়া সংসার চলিতে লাগিল। বিধবা পুত্রবধূ অন্তঃপুরে এক ললনার সহিত অবস্থান করিতেন, পঞ্চানন মিত্র বাহির বাটীতে নিম্নতলে একখানি তক্তকোষে পড়িয়া থাকিতেন।

একদিন অন্তঃপুরে চোর প্রবেশ করিয়া, যে ঘরে সোণা রূপার বাসন সিন্ধুক মধ্যে আবদ্ধ ছিল সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সিন্ধুক ভাঙ্গিতে লাগিল। পুত্রবধূর নিকটস্থ ললনা তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল "ঐ ঘরে চোর আসিয়াছে, তোমার শ্বশুরকে সংবাদ দি।" পুত্রবধূ বলিলেন, "গোল করিও না, তাহা হইলে চোর আসিয়া আমাদিগকে কাটিয়া ফেলিবে। নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাক। চোর চলিয়া গেলে পরে সংবাদ দিও।"

দুর্দ্দিনে এইরূপ সকলেরই বুদ্ধিভ্রংশ হওয়াতে, পঞ্চানন মিত্র অতি সত্বর এমন নিঃস্ব হইলেন, যে অনেক দিন অনশনে থাকিতে হইত। প্রকাণ্ড ভদ্রাসন, ভদ্রাসনের মধ্যেই একটী বাগান ছিল। তাহাতে কলাগাছ ও ডুমুর গাছ যথেষ্ট থাকাতে অনেক দিন কলা ও ডুমুরের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইত। একদিন বিনা লবণে কেবল ডুমুর সিদ্ধ খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে বাধ্য হন।

এক দিন রাত্রি দশটার সময় বাহির বাটীর দরজায় আসিয়া দুই জন জিজ্ঞাসা করিল, "পঞ্চানন বাবু বাটীতে আছেন কি ?"

'কে তোমরা ?' জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর হইল "আমরা বৈদ্যবাটী হইতে আসিতেছি।" পঞ্চানন মিত্রের একখানি তালুক বৈদ্যবাটীতে ছিল। তিনি ভাবিলেন, বোধ হয় এই অসময়ে নায়েব আমার সাহায্য করিবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইয়াছে ; এই আশায় আশান্বিত হইয়া, দরজা খুলিয়া দিলেন, তাহারাও তাঁহাকে একটা ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া বলিল আপনার তালুকে একটা খুনি মকর্দ্দমায় আপনার নামে এই ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। আপনাকে এক্ষণেই হুগলির আদালতে যাইতে হইবে।

পঞ্চানন মিত্র একেবারে নিরাশাসাগরে ডুবিলেন। চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি একবার ঊর্দ্ধদিকে চাহিলেন, মনে মনে বলিলেন, ভগবন্, তুমি বেত মার সত্য, কিন্তু শেষে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যাতনা ত নিবৃত্ত কর! পরে নেত্রবারি রোধ করিয়া উহাদিগকে বলিলেন, ভাই সকল, আমাকে হুগলিতে লইয়া যাইবার পথে একবার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া পরে লইয়া যাইও। তাহারা সম্মত হইল। তিনি রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা বাহাদুর পঞ্চানন মিত্রকে বড়ই ভাল বাসিতেন, সুতরাং হুগলির এক প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবকে এক পত্র দিলেন, সেই পত্র পাইয়া ব্যবহারাজীব বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়াইলেন।

পঞ্চানন মিত্র কলিকাতার গৃহে ফিরিলেন, তদবধি তিনি অতি সাবধানে থাকিতেন, হঠাৎ কাহাকেও বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেন না।

এইরূপ দুঃখের সময় একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া "পঞ্চানন বাবু বাটীতে আছেন কি ?" বলিয়া বাহিরের দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল। আবার কোন্ পেয়াদা আসিয়াছে, ভাবিয়া তিনি অতি সন্তর্পণে দরজার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে তুমি ?' তিনি বলিলেন, "আমি গুরুচরণ।" পঞ্চানন মিত্র তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন।

গুরুচরণ বলিলেন, আপনি আমার প্রতি সন্দেহ করিবেন না। আমি গুরুচরণ বসু, আপনার পূর্ব্ব কর্ম্মচারী। আমি আপনার কষ্টের কথা সমস্ত শুনিতে পাইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।

বহুদিন এমন বাক্য পঞ্চানন মিত্রের শ্রবণপথে আইসে নাই। তিনি দ্বার খুলিয়া দিয়া সাশ্রুনয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ক্রমে শোক এত উথলিত হইল যে অশ্রু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। গুরুচরণ তাঁহাকে অনেক আশ্বাস দিলেন, শেষে বলিলেন, আমার সমস্ত দিন আহার

হয় নাই, আপনার এই দুর্দ্দশা শুনিয়াই আমি বাটী হইতে পদব্রজে সমস্ত দিন চলিয়া আসিতেছি।

পঞ্চানন মিত্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, বৎস, আমিও আজি অন্নাভাবে উপবাসী আছি। যে ডুমুরের উপর ভরসা ছিল সে ডুমুর পর্য্যন্ত গাছে নিঃশেষ হইয়াছে।

গুরুচরণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি বাটীর বাহির হইয়া, নিজের নিকটে যে টাকা ছিল তাহা দ্বারা নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী কিনিয়া আনিলেন এবং প্রভুর ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া পরে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন।

পর দিন নিজব্যয়ে চাউল, ডাউল, লবণ, তৈল, তরিতরকারি সমস্ত কিনিয়া আনিয়া গুরুচরণ বলিলেন, আপনার পুত্রবধূ কি রাঁধিয়াও দিতে পারিবেন না? পুত্রবধূ নিজের গহনা বিক্রয় করিয়া আপনার খরচ চালাইতেন, শ্বশুরের কোনও সংবাদ যদিও লইতেন না, তথাপি সেদিন কি মনে হইল, শ্বশুরের জন্য রন্ধন করিতে রাজি হইলেন।

গুরুচরণ, নিজে রাঁধিতে হইল না সুতরাং যথেষ্ট সময় পাওয়াতে প্রভুকে বলিলেন, আপনার হৌসের কাগজ পত্র আছে কি?

পঞ্চানন মিত্র বলিলেন, কাগজ পত্র অমুক ঘরে পড়িয়া আছে, পোকায় কাটিতেছে। গুরুচরণ তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত কাগজ পত্র বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

গুরুচরণ, বাগান হইতে কলাপাত কাটিয়া আনিয়া আহারের সময় প্রভু ও নিজে তাহা পাতিয়া আহার করেন, আর সমস্ত দিন খাতা পত্র দেখেন। শেষে গুরুচরণ দেখিলেন প্রভুর যেমন দেনা আছে, তেমনি অনেক পাওনাও আছে। তিনি রাত্রিতে প্রভুকে সঙ্গে লইয়া পাওনাদার-দিগের বাটিতে গিয়া যাহার ৫০০০৲ টাকা পাওনা আছে তাহার নিকট ৩০০০৲ টাকা রফা করিয়া, দেনদারদিগের নিকট গিয়া তাহাদের সহিতও বন্দোবস্ত করিয়া দেনা শোধ দিতে লাগিলেন। এই রূপে এক মাসের

মধ্যেই প্রভুকে ঋণমুক্ত করিয়া সমস্ত আপদ্ হইতে নিষ্কৃতি দান করিলেন। পাওনাদারগণ ওয়ারেণ্ট তুলিয়া লওয়াতে এক্ষণে পঞ্চানন মিত্র নির্ভয়ে পথে বাহির হইতে পারিলেন।

গুরুচরণ বলিলেন, ব্যবসায়ে আপনার যেরূপ মস্তিষ্ক আছে তাহাতে আপনাকে আবার ব্যবসায় করিতে হইবে। কিন্তু ব্যবসায় অর্থসাপেক্ষ, সুতরাং আপনি প্রথমে চাকরি করুন। আপনি প্রৌঢ় হইয়াও যুবাপুরুষের ন্যায় বলিষ্ঠ আছেন। চাকরি করিতে আপনার কোনও কষ্ট হইবে না।

গুরুচরণ বহু অন্বেষণান্তে এক ছাতার দোকানে ১০৲ টাকা মাহিয়ানার একটী কর্ম্ম যোগাড় করিয়া প্রভুকে তাহাতে বসাইলেন। তৎকালে লোকে ১০৲ টাকার আয়কে সামান্য আয় মনে করিত না। উহাতে দুই তিনটী লোকের ভরণপোষণ অতি সহজেই হইত। তখন টাকায় দুই মণ তণ্ডুল বিক্রীত হইত।

গুরুচরণ প্রভুকে কাজে বসাইয়া একটী দরিদ্র গৃহস্থের কন্যা ঠিক করিয়া প্রভুকে বলিলেন "আপনাকে বিবাহ করিতে হইবে।"

পঞ্চানন মিত্র বলিলেন, "সেকি গুরুচরণ. আমার এ বয়সে বিবাহ কিরূপে হইবে? তুমি কি আশা কর, আমি আবার স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া পূর্ব্বের মত নূতন সংসার করিব?"

গুরুচরণ বলিলেন, "আপনি যেরূপ বলিষ্ঠ, আপনার পরমায়ু শতাধিক নিশ্চয়ই হইবে। আপনি ভয় পাইবেন না। আপনাকে বিবাহ করিতেই হইবে।"

পঞ্চানন মিত্র পরমোপকারী গুরুচরণের কথা ফেলিতে পারিলেন না, তিনি বিবাহ করিলেন। বালিকা পত্নী স্বামিগৃহে আসিয়াই দেখিলেন, প্রকাণ্ড দরদালানে অনেক শুষ্ক এঁটো পাতা পড়িয়া আছে। স্বামী ও গুরুচরণ যে কলাপাতে অন্ন আহার করিতেন, পুত্রবধূ তাহা ফেলিয়া দিতে পারিতেন না। বালিকা বধূ সেই সমস্ত পাতা ও অন্যান্য আবর্জনা পরিষ্কার

করিলেন ও অল্পদিনের মধ্যেই বাটী খানি বাসের উপযোগী করিয়া তুলিলেন।

গুরুচরণ বালিকা প্রভুপত্নীর বহু গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহাদ্বারা যে প্রভুর সেবা শুশ্রূষার কোনও অভাব হইবে না বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত মনে প্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। পঞ্চানন মিত্র গুরুচরণকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, তুমি যে কেবল আমার সমস্ত জ্বালা নিবারণ করিলে তাহা নহে, আমাকে সুখী করিবার জন্য নানা উপায়ও করিয়া যাইলে। আমার পুত্র নাই, কিন্তু তুমিই আমার পুত্রস্থানীয়। পুত্র সাধারণতঃ পিতার যাহা না করিতে পারে, তুমি আমার তাহা করিলে। বৎস, তুমি বহুদিন গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, ঘরে যাও, স্ত্রীপুত্রদিগকে দর্শন দিয়া সুখী কর। আমি যখন যেরূপ থাকি তোমাকে পত্রদ্বারা জানাইব।"

গুরুচরণ প্রভুর ও তাঁহার নবপত্নীর পদধূলি লইয়া মহা আনন্দে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চানন মিত্র একদিন ছাতার দোকানে ছাতা বিক্রয় করিতেছেন, এক সওদাগর ইংরাজ আসিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ইংরাজ-সওদাগর পঞ্চাননকে চিনিতেন, কিন্তু তিনি অন্যের অধীনে চাকরি করিয়া ছাতা বিক্রয় করিতেছেন দেখিয়া, ইনি সেই ব্যক্তি, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। নাম জিজ্ঞাসান্তে যখন শুনিলেন ইঁহার নাম পঞ্চানন মিত্র, তখন অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি "পঞ্চানন মিত্র এবং কোম্পানি" নামে যে হাউস্ ওয়ালা সেই পঞ্চানন মিত্র?

পঞ্চানন মিত্রের চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আমিই সেই পঞ্চানন মিত্র।" ইংরাজ অবাক্ হইয়া ক্ষণেক তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, শেষে গদগদবচনে বলিলেন, "পঞ্চানন বাবু, আপনি যথার্থই বড়লোক। আপনি এক সময়ে অত বড়

ধনবান্ হইয়াও অভিমান ত্যাগ করিয়া এরূপ সামান্য কাজ করিতে পারেন, ইহাতে আপনার মাহাত্ম্য অধিকতরই প্রকাশিত হইতেছে। আপনি যে এত বড লোক ইহা পূর্ব্বের ন্যায় ধনবান্ থাকিলে বুঝিতে পারা যাইত না। ভগবান্ বোধ হয় আপনার অন্তরে নিহিত নিরভিমানিতা লোককে শিক্ষা দিবার জন্যই আপনাকে এরূপ হীনাবস্থায় উপনীত করিয়াছেন। আপনার মহৎ চরিত এক্ষণে সুপ্রকাশিত হইয়াছে, আর আপনাকে হীনাবস্থায় থাকিতে হইবে না, চলুন আমার আপিসে যাইয়া আমার কার্য্যের আংশিক ভার গ্রহণ করুন।”

এই বলিয়া ইংরাজ মহোদয় পঞ্চানন মিত্রকে আপন আপিসে সাদরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার মহত্ত্বের যোগ্য অর্থাগমের সুবিধা করিয়া দিলেন।

পঞ্চানন মিত্র আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে গুরুচরণকে পত্র লিখিলেন। ‘বৎস গুরুচরণ, আজ তোমার সমুদায় পরিশ্রম সফল হইল। তুমি আমার অভিমান ত্যাগ করাইয়া ভাগ্যে আমাকে ১০৲ টাকা মাহিয়ানার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলে, তাই আজ আবার ঐশ্বর্য্যের পথে দাঁড়াইতে পারিয়াছি। ভগবান্ আমার অভিমান-ত্যাগের পুরস্কার দিয়া আমার পূর্ব্বের সমস্ত ক্লেশের উপশম করিয়াছেন। বাবা, এই আনন্দের দিনে এক বার দেখা দেও।”

ক্রমে পঞ্চানন মিত্রের শুভতর দিন আসিতে লাগিল। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা হইল। তাহাদের সকলগুলিকে মানুষ করিয়া, সংসারী করিয়া ১১১ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ প্রথম প্রথম নব শ্বশ্রূদেবীকে বাটীর সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করিতে দেখিয়া বাগ্দীর মেয়ে বলিয়া ঘৃণা করিলেও তাঁহার সদ্গুণ-প্রভাবে পূর্ব্বদোষ পরিহারান্তে একপরিবারভুক্ত হইয়া সুখে দিনযাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

স্নেহের দায়।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের উত্তরস্থিত ভবনে শ্যামাচরণ দে বাস করিতেন। ইনি শ্যাম বিশ্বাস নামে সকলের নিকট পরিচিত। ইঁহার কনিষ্ঠের নাম বিমলচন্দ্র দে। বিমলচন্দ্র বেনিয়ানের কাজ করেন ও বিলক্ষণ ধনবান্ হন। শ্যামাচরণ দে যে কর্ম্ম করিতেন তাহা বাঙ্গালীর সাধারণতঃ দুর্ল্লভ্য। দুই ভাই পরস্পর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া একত্রে এক সংসারে থাকিয়া বিশেষ উন্নত অবস্থা লাভ করেন। হঠাৎ দৈববিপাকে বিমলচন্দ্রের কার্য্যে লোকসান ঘটে। কয়েক সহস্র টাকার ঋণ হয় ও তজ্জন্য আকুল হইয়া পড়েন। একদিন রাত্রিতে আহার করিতেছেন, হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া আহারে বিরত হন। নিকটে উপস্থিত শ্যামাচরণ দের পত্নী বিমলচন্দ্রকে অন্যমনস্ক দেখিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুরপো, কি ভাবিতেছ? তুমি আহার করিতে করিতে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া আহারে বিরত হইলে কেন?' বিমলচন্দ্র, "না, কিছুই নয়," বলিয়া আবার আহার করিতে করিতে পুনর্ব্বার অন্যমনস্ক হইয়া আহারে বিরত হইলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, তোমাকে অন্যমনস্ক হইবার কারণ বলিতেই হইবে। আমি বুঝিয়াছি, তোমার কোন ভাবী অবমান বা বিপদের ভয়ে তুমি এইরূপ অন্যমনস্ক হইতেছ। আমাকে ভাঙ্গিয়া বল, আমা দ্বারা যদি কোন প্রতীকারের সম্ভাবনা থাকে তাহা আমি করিব। তখন বিমলচন্দ্র, দাদা পাছে জানিতে পারিয়া অসন্তুষ্ট হন, সেই ভয়ে ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, 'বৌদিদি, আমার কাজে লোকসান হইয়া কয়েক সহস্র টাকা ঋণ হইয়াছে। তাহা শোধ না দিতে পারিলে অবমানিত হইব ভাবিয়া আমার অন্নে রুচি নাই, প্রাণের ভিতর কেমন করিতেছে; তাই আহার করিতে ভুলিয়া

যাইতেছি।" জননীবৎ স্নেহপরায়ণা ভ্রাতৃবধু আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, 'ঠাকুরপো, আমার যাহা অলঙ্কার আছে তাহা বিক্রয় করিলে সে ঋণ শোধ হইবে না?' বিমলচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ, তাহাতে শোধ হইতে পারে।" "তবে কেন ভাবিতেছ? তুমি তৃপ্তির সহিত আহার কর আমি আমার সমুদয় অলঙ্কার তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তোমার দাদা ঘুণাক্ষরেও এসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিবেন না।" বিমলচন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া আহার করিবেন কি, আনন্দে এত অধীর হইলেন, যে তাঁহার আর আহার করিবার ক্ষমতা রহিল না, তিনি আনন্দে অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'বৌদিদি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ-যে মাতৃতুল্যা তাহা তোমার আচরণে সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইল।'

বিমলচন্দ্র এ ঘা সামলাইলেন বটে কিন্তু তাঁহার ভাগ্যরবি একেবারে অস্তমিত হওয়াতে অতি শীঘ্রই দেড়লক্ষ টাকার ঋণ হইয়া পড়িল। বন্ধু-বান্ধব তাঁহার এই বিপদ্ দেখিয়া পরামর্শ দিতে লাগিলেন "তুমি ইন্‌সল্‌ভেন্সি লও অন্যথা তোমাকে কারাগারে পচিতে হইবে।" শ্যামাচরণ দে ভ্রাতার বিপদ্ শুনিয়া ও তাঁহার বন্ধুদিগের ইন্‌সল্‌ভেন্সি বিষয়ক পরামর্শ শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। "কি? আমি জীবিত থাকিতে আমার ভাই ইন্‌সল্‌ভেন্সি লইবে? ইন্সসল্‌ভেন্সির অর্থ পাওনাদারদিগকে বঞ্চিত করা, তাহা আমি থাকিতে কখনই হইবে না। আমাদের প্রাণ-ধারণের জন্য যে ব্যয়ের আবশ্যকতা তদ্ব্যতীত সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ পাওনাদারদিগের ঋণ শোধনার্থ ব্যয় করিব।" এই বলিয়া সমস্ত পাওনাদারদিগের সহিত্ বন্দোবস্ত করিয়া মাসে মাসে তাহাদের ঋণের অংশ শোধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় বড় চাকরী আর কোন বাঙ্গালীর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রভূত বেতনের প্রায় সমস্ত টাকাই ভ্রাতার দেনা শোধে ব্যয়িত হইতে লাগিল। নিজে দুঃখের অবস্থায় থাকিয়া এই তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন "ভ্রাতার

পাওনাদারগণ ফাঁকি পড়িল না। ভ্রাতাকে কেহ এক কথা বলিতে পারিল না।”

আশ্রিত পশুর প্রতি দয়া।

শুনা যায়, পূর্ব্ব বঙ্গের কোনও গণ্ডগ্রামে এক রাজা উপাধিধারী জমিদার বাস করিতেন। এক সময়ে তাঁহার পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া হওয়াতে বাটীর কর্ত্রী মানত করেন, সন্তানের রোগোপশম হইলে, মা দুর্গার নিকট মহিষ বলি দিব। সন্তানের রোগোপশম হওয়াতে কর্ত্রী স্বামীকে বলিয়া রাখেন এবারে পূজার সময়ে মহিষ বলি দিতে হইবে।

পূজার দিন উপস্থিত হইল, মহিষ আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহার সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটিল। ইহাতে গৃহস্বামী রাজাবাহাদুর স্থির করিলেন গৃহে পোষিত যে মহিষটী আছে তাহাকেই বলি দিব।

গৃহপালিত মহিষটী রাণীমাতার বড় বশীভূত ছিল। মহিষটী আর আর মানুষের নিকট দুর্দ্দান্ত, কেবল রাণীর নিকট শান্ত সুতরাং রাজা এই মহিষকে যে বলি দিবেন ইহা সাহস করিয়া রাণীকে বলেন নাই।

নবমী পূজার দিন উপস্থিত হইল, রাণীমাতা ভাবিয়াছিলেন মহিষ সংগ্রহ হইয়াছে।

এদিকে গৃহপালিত মহিষকে বন্ধন করিয়া আনা হইল, তাহাকে স্নান করান হইল, তাহার মাথায় সিন্দূর দেওয়া হইল, তাহার গলদেশ ঘৃত দ্বারা নিপীড়িত করা হইল, ও উৎসর্গ করা হইল। এতক্ষণ মহিষ শান্ত ভাবে ছিল, কিন্তু যখন তাহাকে হাড়কাঠে ফেলা হইল তখন সে আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া একেবারে দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়িল। তাহাকে ২০।২৫ জন লোকেও ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে হাড়কাঠ সবলে উৎপাটিত করিয়া সেই হাড়কাঠ সমেত ছুটিয়া প্রাসাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া

রাণীমাতাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার নিকট অগ্রসর হইতে পারে এমন সাহস কাহারও হইল না। শেষে রাণীমাতাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ঠিক মনে হইল রাণীমার শরণাগত হইল। রাণীমাতা দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "একি সর্ব্বনাশ! আমাদের পোষা মহিষকে কাটিবার জন্য কে আয়োজন করিয়াছে?" বাটীর দেওয়ান আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, মা, মহিষ মিলে নাই কাজেই মহারাজ এই মহিষ বলি দিতে হুকুম দিয়াছেন। আপনি রাজাজ্ঞার অন্যথাকরণে সহায়তা করিবেন না। মহারাজ যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন তাহাতে আপনি জিদ করিলেও আপনার কথা থাকিবে না। আপনি যখন আপনার পুত্রের মানত করিয়াছেন তখন মানত রক্ষার জন্য আপনাকে এই মহিষ অর্পণ করিতে হইবে, অন্যথা আপনার পুত্রের অকল্যাণ হইবে।

রাণী মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আমি ত এ মহিষ বলি দিবার মানত করি নাই, সুতরাং ইহাকে বলি দিতে কিছুতেই দিব না।"

রাণীমাতা একমাত্র একদিকে, আর সমস্ত লোক অন্যদিকে। কাজেই তাঁহার সমস্ত কথা ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মহিষ যখন উৎসর্গ করা হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই ইহাকে বলি দিতে হইবে, অন্যথা প্রত্যবায় ঘটিবে, এই কথা সকলেরই মুখে শ্রুত হইতে লাগিল। রাণীমাতার পুত্রগণ আসিয়া তাঁহাকে এক গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার কল্পনা করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তিনি মহিষের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন সুতরাং মহিষের ভয়ে কেহই তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করিল না।

এরূপ অবস্থায় থাকিয়াও রাণীমাতা মহিষকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, নানা কৌশলে মহিষকে নূতন বিপুল হাড়কাঠের নিকট আনা হইল, ও তাহাকে বলিদান দিবার সমস্ত উদ্যোগ হইল। সকলে শক্তিসমবায়ে

মহিষকে হাড়কাঠে ফেলিল। মহিষ এবারে আত্মশক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাণীমাতার দিকে ফেল ফেল করিয়া তাকাইয়া রহিল। রাণীমাতা এবারে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং আর একখানি পাঁটা কাটিবার যে খড়্গ ছিল তাহা ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহিষ বলি দিবে দেও, কিন্তু ঐ খড়্গ মহিষের উপর পাড়িবামাত্র এই খড়্গ আমার গলায় পাতিত হইবে।" তিনি এই কথাগুলি এমন দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন যে, সকলে বিপদ্ গণনা করিলেন। সুতরাং মহিষ বলি দিতে আর কাহারও সাহসে কুলাইল না।

রাজা বেগতিক দেখিয়া বলিলেন, যেরূপ দেখিতেছি স্ত্রীহত্যা অনিবার্য্য হইবে। বলি না হইলে যে প্রত্যবায় হয় হউক, স্ত্রীহত্যা হইলে সংসার জ্বলিয়া যাইবে।

রাজার হুকুমে বলিদান রহিত হইল, রাণীমাতা যেন মরা ছেলে পুনর্জীবিত পাইলেন এই ভাব দেখাইয়া চিত্তের মহাপ্রসন্নতার সহিত মহিষের গলা জড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তাহাকে গোয়াল ঘরে লইয়া গেলেন, এবং "আহা বাছাকে কত কষ্টই দিয়াছে" বলিতে বলিতে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। যে ললনার চন্দ্রানন চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্তও কখন দেখিতে পায় নাই তিনি আজি দয়ার প্রভাবে স্বয়ং ভগবতীর রূপ ধরিয়া জনগণের মধ্যে নির্লজ্জভাবে চামুণ্ডার ন্যায় ভ্রমণ করিলেন। সকলের মনে এই একটা ধারণা হইল, ইনিই স্বয়ং ভগবতী, একটী মানুষ তাঁহার যেমন প্রিয়, একটী পশুও তাঁহার তেমনি প্রিয়; তাঁহাকে রক্ষার জন্য তিনি স্বয়ং বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

আন্তরিক স্নেহবর্ষণের প্রতিদান।

দক্ষিণ বারাসাতে নিধিরাম নামে এক উন্মত্ত ব্যক্তি ছিল। তাহাকে সকলে নিধে পাগলা বলিত। নিধিরামের সংসারে কেহ না থাকাতে তাহাকে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রাণধারণ করিতে হইত। ক্ষুধা পাইলেই এক গৃহস্থের বাটী যাইয়া পাত পাড়িয়া "ওমা, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েচে, বড় ক্ষিদে পেয়েছে, বড় ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দে, খেতে দে, খেতে দে" বলিয়া কাতরতা দেখাইত ; কাজেই তাহাকে কেহ ফিরাইত না। পান্তা কড়কড়া যাহাই ঘরে থাকিত তাহাকে তাহাই দিত, নিধিরামও পরম আনন্দে তাহা ভক্ষণ করিত, ও নিজের যে কয়েকটী পোষা কুকুর ছিল তাহাদিগকে যত্নের সহিত খাওয়াইত। কখন কখন কুকুরদিগকে খাওয়াইয়া নিজে উপবাসী থাকিত। কুকুর গুলি তাহার প্রাণ ছিল। কোনও কুকুরের অসুখ হইলে তাহাকে সন্তানের ন্যায় কোলে করিয়া শুশ্রূষা করিত। কুকুরগুলিও নিধিরামকে ক্ষণেক দেখিতে না পাইলে খুঁজিয়া বেড়াইত ও যতক্ষণ না দেখিতে পাইত ততক্ষণ আহার পর্য্যন্ত করিত না।

একদিন নিধিরামের পীড়া হইল, এই পীড়াই সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। নিধিরাম ঐ পীড়াতেই পঞ্চত্ব পাইল। নিধিরামের কেহই না থাকাতে তাহার মৃতদেহের সৎকার কে আর করিবে, ভাবিয়া গ্রামের সহৃদয় ব্যক্তিগণ তাহার সৎকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইল, কিন্তু নিধিরামের নিকট গিয়া দেখে তাহার পোষা কুকুরগুলি তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে, কাহার সাধ্য নিধিরামের কাছে যায়! নিধিরামের গায়ে হাত দিতে কাহারও সাহস হইল না। পাঁচ ছয়টা কুকুর যে ভাবে রুখিয়া দাঁড়াইল, সাধ্য কি কেহ তাহার কাছে যায়। ভদ্রব্যক্তিগণ শেষে অনন্যগতিক হইয়া পুলিসে সংবাদ দিল। পুলিস হইতে দশ বার জন চৌকীদার আসিয়া যষ্টি

হস্তে ঘেরিয়া দাঁড়াইল ও অতি কষ্টে তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাইবার সাহায্য করিতে পারিল। কিন্তু শ্মশানে লইয়া যাইলে কুক্কুরদিগকে আর থামাইয়া রাখিতে পারা গেল না। সকলে কুক্কুরের দংশন ভয়ে যেমন পলায়ন করিল অমনি কুক্কুরগণ তাহাকে ঘেরিয়া বসিল। সেই অবধি কুক্কুরগণ নিধিরামকে আর ছাড়িল না। দিবারাত্রি তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া রহিল। সাধ্য কি, শকুনি বা শৃগাল তাহার নিকট যায়! কুক্কুরগণ অনাহারে থাকিয়া নিধিরামকে আর কতদিন চৌকী দিবে? এক একটী করিয়া মরিতে লাগিল। নিধিরামের দেহ পচিয়া গলিয়া শেষ হইয়া গেল, কুক্কুরগণও প্রাণবিসর্জ্জন দিল; এবং আন্তরিক স্নেহ প্রদর্শনে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক সামান্য প্রাণী পর্য্যন্তও যে উন্মত্ত হইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া গেল।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

পণ্ডিত হরানন্দ বিদ্যারত্ন।

ইঁহার পুত্রের নাম পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পঞ্চাশদূর্দ্ধ বয়সে প্রবল রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার রোগ এরূপ কঠোর আকার ধারণ করিল যে কলিকাতার প্রধান প্রধান ডাক্তার একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। শাস্ত্রীর বৃদ্ধা মাতা পুত্রের এই রোগের সংবাদ পাইয়া জগদম্বাকে প্রাণের সহিত ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। ডাক্তারদিগকে একেবারে নিরাশ ও চিকিৎসায় উদ্যমহীন দেখিয়া সমীপাগত শাস্ত্রীর বন্ধুদিগকে সানুনয়ে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা একবার কবিরাজি চিকিৎসা করাও। আমাকে কে যেন বলিতেছে, কবিরাজি চিকিৎসায় ইহার প্রাণ পাওয়া যাইবে।" বন্ধুবান্ধবগণ মনে মনে হাসিলেন বটে কিন্তু তাঁহার অনুরোধ অন্যথা করিতে না পারিয়া অগত্যা কবিরাজ দ্বারকানাথকে আহ্বান করিলেন। দ্বারিক কবিরাজ আসিয়া শাস্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসা করিবার সাহস করিলেন না, সুতরাং যাহাতে শাস্ত্রীর চিকিৎসার ভার তাঁহার হাতে না পড়ে তাহার জন্য নানা ফন্দি খুঁজিতে লাগিলেন। শাস্ত্রীর মাতা দ্বারিক কবিরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বাবা, তুমি আমার পুত্রের চিকিৎসা করিতে কিন্তু করিও না, আমার বিশ্বাস হইতেছে তুমি এই চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিলেই আমার পুত্র আরোগ্যলাভ করিবে। কবিরাজ শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতার মুখপানে তাকাইয়া তাঁহার মুখে এমন একটু কি দেখিলেন যাহাতে তাঁহার মনে সাহসের উদয় হইল, তিনি অমনি শাস্ত্রীর মাতাকে মাতৃসম্বোধনে বলিলেন "তবে মা, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন কৃতকার্য্য হই।"

মাতা বলিলেন, "বাবা, আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি দেখিও তুমি কৃতকার্য্য হইবে।"

দ্বারিক কবিরাজ ঔষধ দিতে আর দ্বিধা করিলেন না। তিনি প্রফুল্লহৃদয়ে শাস্ত্রীর মায়ের চরণধূলি লইয়া শাস্ত্রীর চিকিৎসার ভার লইলেন, ও তাঁহাকে ঔষধ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দেশে শাস্ত্রীর পিতা স্বস্ত্যয়নার্থ দিন রাত্রি ভগবান্‌কে ডাকিতেছিলেন। তিনি স্বস্ত্যয়ন শেষ করিয়া যাঁহা দ্বারা পুষ্প বিল্বপত্র পাঠাইলেন তিনি দেশে প্রত্যাগত হইয়া পিতাকে সংবাদ দিলেন "শিবনাথ শাস্ত্রীকে আর মারে কে ?" স্বয়ং ভগবতী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন, অন্তকের সাধ্য কি যে, তাঁহার নিকট অগ্রসর হয়। শাস্ত্রী আরোগ্য লাভ করিলেন। মাতা তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থদেহ ও কর্ত্তব্যকার্য্যে নিবিষ্ট দেখিয়া কিছুদিন 'পরে পতি পুত্র সম্মুখে দেখিতে দেখিতে নিশ্চিন্তমনে স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন।

শ্রীরাম শিরোমণি।

বহুদিন হইল বালীতে শ্রীরাম শিরোমণি নামে এক অতি নিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অধিকাংশ সময়েই দেবপূজা ধ্যানধারণা প্রভৃতিতে নিয়তমনা থাকিতেন। দেশের সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। বাটীতে কোন কাজকর্ম্ম হইলে তিনি দেশবাসী সমস্ত ব্যক্তিকেই নিমন্ত্রণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। অথচ তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব ছিলেন। প্রতিবৎসর তিনি দুর্গোৎসব করিতেন। যে কারিকর তাঁহার জন্য দুর্গার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিত তাহাকে তিনি সমস্ত বৎসরে ২॥৹ টাকা দিবেন, এইরূপ কথা স্থির থাকিত। প্রতিমা অতিক্ষুদ্র হইত বটে কিন্তু লোকজন তিন চারি হাজার সমবেত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিত। একবার তিনি পূজার দিন প্রভাতে গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে আসিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পূজার নৈবেদ্যের কিছু আছে কি? পত্নী বলিলেন একটী নারিকেল পাইয়া তাহাতে নারিকেল লাড়ু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। এক ব্যক্তি একটা বাতাবীলেবু দিয়াছে তাহাও আছে। শ্রীরাম শিরোমণি মহা আনন্দে বলিলেন, "তবে আর ভাবনা কি? আমি পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া তবে পূজায় নিবিষ্ট হই" এই বলিয়া তিনি পুষ্পচয়নান্তে পূজায় চিত্ত নিবেশ করিলেন।

এদিকে গ্রামের স্ত্রীলোকগণ গঙ্গাস্নানান্তে শিরোমণি মহাশয়ের বাটীতে প্রতিমা দেখিয়া যাইব বলিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, পূজার বিশেষ কোনও আয়োজন নাই, অথচ শিরোমণি মহাশয় পূজায় নিবিষ্ট। বাটীর কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন অর্থের অভাবে এখনও কোন উদ্যোগ করিতে পারেন নাই।

প্রতিমাদর্শনার্থ সমাগত স্ত্রীলোকগণ গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া প্রত্যেকেই এক একটী সীদা ও রন্ধনাদির সাহায্যের জন্য নিজ নিজ সন্তানদিগকে পাঠাইতে লাগিলেন। শেষে এত সীদা ও পাকার্থ এত লোক আসিল যে তিন দিন চারি পাঁচ সহস্র ব্যক্তি প্রসাদ পাইল তথাপি কোন বিষয়ে অপ্রতুল হইল না।

একদিন শিরোমণি মহাশয় গৃহে পূজা করিতেছেন, পত্নী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল, "তুমি পূজায় বসিয়া আছ, ওদিকে ছেলে যে বানে ভাসিয়া গেল," এই কথা বলিতে বলিতে কর্ত্রী কাটা ছাগলের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন ও চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। শিরোমণি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র কোথায় ভাসিয়া গেল তাহা কি কেহই স্থির করিতে পারে নাই ?" কর্ত্রী অতি কাতরভাবে বলিলেন, "পুত্র কোথায় ভাসিয়া গেল তাহা কেহই স্থির করিতে পারিতেছে না।" শিরোমণি মহাশয় "মনুষ্যের প্রয়াসের বাহিরে গিয়াছে, আর অন্বেষণ অনাবশ্যক," মনে করিয়া চক্ষু দুইটী মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হে কল্যাণেশ্বর, নিরুপায়ের উপায় তুমি, আমি তোমারই শরণ লইলাম, তুমি আমার পুত্রকে রক্ষা কর।"

শিরোমণি মহাশয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য; ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কেবল নিমীলিতনয়নে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। পত্নী একবার গঙ্গার ঘাটে, আবার স্বামীর নিকট আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছেন ও "বাবা, আমাকে মা বলে ডেকে ছুটে কাছে আয়" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন।

শিরোমণি মহাশয়ের ভাব দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তিনি ভগবানের নিকট যেরূপ ভাবে হত্যা দিয়াছেন তাহাতে সন্তান ফিরিয়া না আসিলে

তিনি আর আসন ত্যাগ করিবেন না; সেই আসনেই ক্রমে বিলীন হইবেন।

বেলা প্রায় চারিটা বাজিল, পল্লিবাসিগণ তাঁহার সন্তানের কোনও উদ্দেশ পাইল না। সকলেই নিরাশ হইল। কিন্তু শিরোমণি মহাশয়ের মুখে কিছুমাত্র নিরাশার চিহ্ন নাই। তিনি যাঁহার করুণায় চিরদিন বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারই করুণার উপর নির্ভর করিয়া অচল অটল ভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া রহিলেন। পাঁচটা বাজিল শিরোমণি মহাশয় চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থিরভাবেই সাশ্রুনয়নে অবস্থান করিতেছেন, হঠাৎ অমৃত মাখা এই কথাটী শুনিতে পাইলেন "এই আমাদের বাড়ী গো।" তৎক্ষণাৎ মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন "আয় বাবা, আমার কোলে আসিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর, ঐ দেখ তোর জনক কল্যাণেশ্বরের দ্বারে পড়িয়া তোর প্রাণভিক্ষা করিতেছেন।"

"হে লজ্জানিবারণ কল্যাণেশ্বর, সত্য সত্যই কি তুমি তোমার ভক্তের মান রাখিলে?" এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীরাম শিরোমণি পুত্রের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া আবার চক্ষু নিমীলিত করিলেন এবং ভক্তিতে গদগদ হইয়া অবিরত ভক্তিবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন।" বহুক্ষণ তাঁহার কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না।

শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র ভাসিয়া গিয়া জেলেদের বড় জালে পতিত হয়। জেলেরা অচৈতন্য অবস্থায় পুত্রটীকে পাইয়া, অগ্নির উত্তাপে ও নানা উপায়ে উহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া, বালকেব নিকটেই তাহার বাসস্থান জানিয়া তাহাকে রাখিতে আসিয়াছিল। তাহারা শ্রীরাম শিরোমণির হত্যা দিবার অবস্থা দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, এরূপ ভক্তের পুত্রকে স্বয়ং ভগবান্‌ই রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের জাল তুলিতে কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব হইলেই ত ইহার প্রাণ বাহির হইয়াছিল!

মাতৃ আশীর্ব্বাদে বিশ্বাস।

চব্বিশপরগণার অন্তর্ব্বর্ত্তী বারুইপুর মহকুমা খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের একটী প্রধান অধিষ্ঠান স্থান। পূর্ব্বে অনেক সাহেব মিশনরি তথায় বাস করিতেন ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন।

একদা একটী বাঙ্গালী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পিতা মাতা ভাই ভগিনী ও পত্নী পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টানদিগের অধিষ্ঠানে অবস্থান করিতে থাকেন। সাহেব মিশনরিগণ যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহার পত্নী আছেন তখন তাঁহার পত্নীকে আনাইয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নূতন খৃষ্টান্ বাঙ্গালী উক্ত সাহেবদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, বাঙ্গালীর মেয়ে খৃষ্টানের সংস্পর্শে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, সুতরাং বুঝাইয়া খৃষ্টান্ করা অসম্ভব; অতএব সে আশা ছাড়িয়া দিন। মিশনরিগণ বলিতে লাগিলেন, একবার যদি কোনও রূপে তোমার পত্নীকে এই আড্ডায় আনিয়া ফেলিতে পার তাহা হইলে আমাদের ব্যবহারে তিনি এমন আপ্যায়িত হইবেন যে শেষে খৃষ্টান্ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। অতএব যে কোন প্রকারই হউক তাহাকে একবার এখানে আনাইয়া ফেল।

বাঙ্গালী খৃষ্টান্ তাঁহাদের অনুরোধে পত্নীকে বহু কৌশলে একেবারে বারুইপুরের খৃষ্টান্‌দিগের অধিষ্ঠানে আনিয়া ফেলিলেন।

পত্নী খৃষ্টান্-পরিবৃত স্থানে উপস্থিত হইয়া ভয়ে এত কাঁপিতে লাগিলেন যে তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। স্বামীর দিকে একবার সজল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া "এই বুঝি তুমি আমাকে শ্বশুরালয়ে আনিলে" বলিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

মিশনরিগণ নব খৃষ্টানের পত্নী আসিয়াছেন শুনিয়া আনন্দে তাঁহাকে বুঝাইতে বসিলেন। রমণী তাঁহাদের পদপ্রান্তে পড়িয়া সানুনয়বচনে বলিতে লাগিলেন, বাবারা, আমাকে ঘরে পাঠাইয়া দিন, আমি খৃষ্টানদিগের সংস্পর্শে থাকিতে পারিব না। দোহাই আপনাদের, আমাকে ঘরে পাঠাইয়া দিন।"

রমণী বহু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা অনেক বুঝাইয়া শেষে এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন, "আপনি দুই একদিন এইখানে থাকিলেই ঝতে পারিবেন, আপনি কেমন উৎকৃষ্ট সমাজে আসিয়াছেন। এক্ষণে যাহার জন্য অনুতপ্ত, পশ্চাৎ তাহারই জন্য কতই তৃপ্তি লাভ করিবেন।"

রমণী যখন দেখিলেন তথা হইতে তাঁহার নির্গমনের আর কোনও আশা নাই, তখন তিনি স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমাকে তোমরা কিরূপে রক্ষা করিবে কর, আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করিব।" এই বলিয়া তিনি অন্নজল ত্যাগ করিলেন।

স্বামী ও মিশনরিগণ ভাবিলেন, নবাগত রমণীর প্রথম শোক তিরোহিত হইলে পরে সহজে আহারাদি করাইতে পারিবেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা তাঁহাকে তৎকালের জন্য উপেক্ষা করিলেন।

এক গোয়ালিনী ঐ অধিষ্ঠানে দুগ্ধ যোগাইত। সে এই নবাগত রমণীর দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অবসর পাইবামাত্র পরামর্শ দিল, "দেখ মা, এই বারুইপুরে রায়চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণ বাস করেন। তাঁহাদের অতুল প্রভাব। যদি তাঁহাদের শরণ লইতে পার, বোধ হয় ইঁহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার। তাঁহাদের বাটী ঐ দেখা যাইতেছে। তুমি পুষ্করিণীতে হাত মুখ ধুইবার ছল করিয়া আমার সহিত বাহির হইলে, আমি পথ দেখাইয়া দিব, তুমি ঊর্দ্ধশ্বাসে জমিদারদিগের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে কর্ত্রীমার কাছে গিয়া তাঁহার শরণাগত হইলে আর তোমার কোনও ভাবনা থাকিবে না।"

গোয়ালিনীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া রমণী কুন্তল বাঁধিলেন ও সাহসে ভর করিয়া তাহার নির্দ্দেশানুরূপ জমিদারদিগের বাটীর অভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন। গোয়ালিনী যখন দেখিল রমণী জমিদার বাবুদের বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন চীৎকার করিয়া মিশনরিদিগকে সংবাদ দিল, 'ওগো তোমাদের এখানে যে নূতন মেয়েটী এসেছিল সে ঐ দেখ দৌড়িয়া পলাইতেছে।

এই সংবাদ পাইবামাত্র খৃষ্টান্‌গণ রমণীকে ধরিতে ছুটিল। তাঁহারা নিকটে না যাইতে যাইতে উক্ত ললনা, উপবাসে দুর্ব্বল দেহে জমিদারের অন্দর গৃহে প্রবেশ করিয়া একেবারে কর্ত্রীমাতার চরণ ধরিয়া ফেলিলেন, "ওমা, আমায় রক্ষা কর, আমাকে যাহাতে খৃষ্টান না করিতে পারে তাহার উপায় কর। আমি ব্রাহ্মণকন্যা হইয়াও আপনার চরণ ধরিয়াছি, আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কর্ত্রীমাতা, 'বাছা, "তোমার কোনও ভয় নাই। তোমাকে রক্ষা করিতে যদি আমাকে সর্ব্বস্বান্তও হইতে হয় তাহাও হইব" বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। রমণী যেন জীবন পাইলেন।

খৃষ্টান্‌গণ যখন দেখিলেন রমণী অন্দরে প্রবেশ করিয়াছেন তখন তাঁহারা নিবৃত্ত হইয়া, বড় জমিদার বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, আমাদের একটী মেয়ে আপনার অন্দরে প্রবেশ করিয়া বোধ হয় আপনার মাঠাকুরাণীর আশ্রয় লইয়াছেন। আপনি আপনার মাতাকে বুঝাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলুন। অন্যথা সাহেবগণ আপনার নামে নালিস করিয়া আপনাকে বিপন্ন করিবেন।

বড় জমিদার বাবু ভাবিলেন, 'স্ত্রী স্বামীর নিকট থাকিয়া যাহাই করুক না কেন, আমার এ মিছা দায়ে থাকিয়া সাহেবদিগের বিরাগভাজন হইবার প্রয়োজন কি? স্বামী স্ত্রীকে লইয়া খৃষ্টান্ করুক আর হিঁদুই করুক, তাহাতে আমার কি?' ইত্যাদি ভাবিয়া মাতার নিকট যাইলেন

'সাহেবদের সহিত ঝগড়ায় পারিব না, বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ঐ একজাতীয়, তিনি নিজের জাতির দিকে যত টানিবেন, তত কি আমার দিকে টানিবেন? শেষে কি মা, আমরা স্বামীর প্রতিকূলচারিণী একটা মেয়ে রক্ষা করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইব? যে স্ত্রী স্বামীর অনুবর্ত্তিনী নন তাঁহার জন্য আমাদিগকে কেন বিপন্ন করিব? ইহাতে আমাদের পুণ্য না হইয়া পাপ হইবে' ইত্যাদি বলিয়াও যখন মাতাকে রাজি করিতে পারিলেন না, তখন জোর করিয়া রমণীকে খৃষ্টান্‌দিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

মাতা জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই কার্য্যে হতাশ হইয়া, কনিষ্ঠপুত্র রাজবল্লভ রায়চৌধুরীর নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "বৎস, তুমি আসিয়া আমার শরণাগত এক ব্রাহ্মণকন্যাকে যতক্ষণ খৃষ্টান্‌দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ না করিতেছ, ততক্ষণ আমি অন্ন জলস্পর্শও করিব না। তুমি আসিয়া মাতৃজীবন রক্ষা কর।"

রাজবল্লভ রায়চৌধুরী সে দিন কলিকাতায় বেলিয়াঘাটায় অবস্থান করিতেছিলেন। বেলিয়াঘাটা বারুইপুর হইতে প্রায় ১৭ মাইল। বেলিয়াঘাটায় লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজবল্লভ রায়ও সমস্ত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ শকটারোহণে বারুইপুর যাত্রা করিলেন। তখন রেলওয়ের পথ হয় নাই।

বারুইপুরে উপস্থিত হইয়া অগ্রে মাতার চরণ পূজা করিলেন ও তাঁহার আজ্ঞা লইয়া অসংখ্য লেঠেল সহিত খৃষ্টান্‌দিগের ভবনে উপস্থিত হইলেন ও যে গৃহে ব্রাহ্মণরমণী অবস্থান করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া ললনাকে পাল্কীতে উঠিতে বলিলেন। রমণী, আনন্দে গদগদস্বরে "বাবা, তুমি যেমন অসহায়কে রক্ষা করিলে, ভগবান্ সেইরূপ তোমার মঙ্গল করিবেন" বলিয়া পাল্কীতে উঠিলেন, পাল্কী আসিয়া জমিদারের অন্দরে লাগিল। রমণী আশ্রয় পাইয়া বাঁচিলেন। লেঠেলগণ যে ঘরে রমণী

ছিলেন, সেই ঘরের সমস্ত দ্রব্য নিকটস্থ একটা ডোবায় ফেলিয়া দিল। খাট, টেবিল্, চেয়ার, ঝাড়, লণ্ঠন, আয়না যাহা কিছু ছিল সমস্ত জলে ফেলিয়া দিয়া আপনাদের ক্রোধ শান্ত করিল।

রাজবল্লভ রায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি ভ্রাতাকে বিশেষ তিরস্কার করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন 'তোমার এই অবিবেচনার কার্য্যের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে।' তখন রাজবল্লভ রায় করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, 'দাদা, আপনি কি মায়ের আশীর্ব্বাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন না? তিনি যখন অভয় দিয়াছেন, তখন আমাদের অমঙ্গল হইতেই পারে না। আপনি দেখিবেন আমাদের সমস্ত আপদ্ দক্ষিণ বায়ু-তাড়িত মেঘের ন্যায় কোথায় উড়িয়া যাইবে।'

মিশনরিসাহেবেরা ক্রোধে আকুল হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট অভিযোগ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিজে তদারক করিতে আসিলেন।

যে গৃহে রমণী ছিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, সেই গৃহে কিছুই নাই, সমস্ত জলশায়ি হইয়াছে। জল হইতে সমস্ত জিনিস তোলা হইল, একটী দ্রব্যও ভাঙ্গে নাই। তিনি এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে গৃহের কোণে একটা শয্যা গুটান আছে দেখিলেন। এই শয্যাটী, রমণী খৃষ্টান্‌দিগের শয্যায় শুইবেন না বলিয়া নিজে গুটাইয়া কোণে রাখিয়াছিলেন। লেঠেলেরা ঐ শয্যাটা জলে ফেলিয়া দিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ ভাবিলেন, যে সমস্ত দ্রব্য জলে ফেলিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই কেবল তাহাই জলে ফেলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা জমিদারের লোকের কাজ নয়, মিশনরিদিগের ভৃত্যেরাই নালিস পাকাইবার জন্যই নিজেরা সন্তর্পণে জিনিসগুলি জলসাৎ করিয়াছে। ইহা সাজান মকর্দ্দমা। এইরূপ বিশ্বাস হওয়াতে ম্যাজিষ্ট্রেট্ মকর্দ্দমা নামঞ্জুর করিলেন ও পাল্কী করিয়া উক্ত রমণীকে তাঁহার পিতার আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। মাতৃ আশীর্ব্বাদ সফল হইল।

স্বামি-শুশ্রূষা।

কুম্ভকার-ললনা পার্ব্বতী

যশোহর জিলার অন্তঃপাতী এক গণ্ডগ্রামে রামজীবন নামে এক কুম্ভকার বাস করিত। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ত্রিলোচন। রামজীবন প্রতিমাগঠন কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করে, এবং পুত্রকেও আপন কার্য্যে দীক্ষিত করে। পুত্রের যৌবনারম্ভে একটী সুলক্ষণা কন্যার সন্ধান পাইয়া তাহার সহিত বিবাহ দেয়। পুত্রবধূ যেমন রূপগুণসম্পন্না তেমনি বিচক্ষণা, তাহার গুণে সংসার সুখের আধার হইয়া উঠিল।

একদিন রামজীবন জ্যেষ্ঠপুত্রকে সঙ্গে লইয়া এক- দূরবর্ত্তী গ্রামে দুর্গা-প্রতিমা গঠনার্থ গমন করে। ত্রিলোচন তথায় কিয়ৎদিবস অবস্থানানন্তর যৌবনসুলভ চপলতায় এমন একটী কুকার্য্য করিয়া বসিল যে, পিতাপুত্র উভয়কেই তথা হইতে তাড়িত হইতে হইল। পিতা রামজীবন ক্ষোভে অবমাননায় আত্মহারা হইয়া সন্তানের মুখদর্শন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া দেশে চলিয়া গেল। ত্রিলোচন পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ক্ষোভে দুঃখে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল, বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না।

রামজীবন গৃহে উপনীত হইলে বাটীর সকলে ত্রিলোচনের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল, রামজীবন লজ্জায় ঘৃণায় পুত্রকে ধিক্কার দিতে দিতে তাহার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। বাটীর সকলে সাহস করিয়া ত্রিলোচন সম্বন্ধে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, সকলেই নির্ব্বাক্ রহিল।

এক্ষণে পার্ব্বতীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর। রাত্রিতে সকলেই নিদ্রিত

হইল, কেবল পার্ব্বতীর চক্ষে নিদ্রা নাই। পার্ব্বতী স্বামিবিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া শেষে মনে মনে স্থির করিল, 'যেখানে ত্রিলোচন সেই খানেই পার্ব্বতী। ত্রিলোচন ছাড়া পার্ব্বতীকে একাকিনী থাকিতে কে কোথায় শুনিয়াছে?' এই কথা বলিতে বলিতেই যেন তাহার মনে চতুর্গুণ সাহস আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সকলকেই সুষুপ্ত দেখিয়া, এই ঠিক অবসর, ভাবিয়া একবস্ত্রেই গৃহের বাহির হইল, ও যে দিকে পা যায় সেই দিকেই চলিতে লাগিল। "মা দুর্গে, আমার স্বামীর নিকটে আমাকে লইয়া যাও" এই প্রার্থনা করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিতে লাগিল।

রাত্রি অবসান হইল, পার্ব্বতী এক বৈষ্ণবীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে মাতৃসম্বোধনে বলিল, 'মা, আমি নিরাশ্রয়; তোমার আশ্রয় লইলাম। মা, তুমি আমাকে আশ্রয় দান কর।'

বৈষ্ণবী এরূপ একটী বালিকা পাইয়া বহু আশান্বিতা হইয়া ভাবিতে লাগিল, এরূপ কন্যা যদি আমার নিকট থাকে তবে ইহা দ্বারা আমার অনেক উপকার হইবে, এই ভাবিয়া অতিশয় যত্ন প্রকাশ করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিল। বৈষ্ণবীর যত্নে পার্ব্বতী বিশেষ শুশ্রূষা পাইয়া পথশ্রম ও অনিদ্রাজনিত নানা কষ্ট বিস্মৃত হইল। কিন্তু অপরাহ্ণে বৈষ্ণবীর কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিল বৈষ্ণবী তাহাকে কুপথে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। পার্ব্বতী বিপদ্ দেখিয়া রাত্রিকালে বৈষ্ণবী নিদ্রা যাইলে প্রদীপ জ্বালিয়া সলিতা পোড়াইয়া নিজের মুখ ও সর্ব্বাঙ্গে ছ্যাঁকা দিতে লাগিল। মুখ ও সর্ব্বাঙ্গ পোড়া দাগে কৃষ্ণবর্ণ হইল ও সমুদায় দেহ ফুলিয়া উঠিল। প্রভাতে বৈষ্ণবী পার্ব্বতীর অসম্ভাবিত বিরূপ দেখিয়া হতাশ হইয়া তাহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিল।

পার্ব্বতী বৈষ্ণবীর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি ভাবিয়া আনন্দে পথে বাহির হইল, এবং কৃত্রিম বিরূপতাই আমার প্রধান সহায় ভাবিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়া নির্ভয়ে পথে চলিতে লাগিল। এক্ষণে ভিক্ষামাত্র

উপজীবিকা। পার্ব্বতী ভিক্ষা করিতে করিতে, নানা দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোথায় স্বামী কোথায় স্বামী, এই মাত্র তাহার চিন্তা।

ক্রমে পার্ব্বতী মুর্শিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত। এই স্থানে একদিন গঙ্গার ধারে বসিয়া কেবল স্বামীর চিন্তায় নিমগ্না আছে এমন সময়ে একটী যুবক তাহার নেত্রপথে পতিত হইল। যুবককে দেখিয়া পার্ব্বতী শিহরিয়া উঠিল। নিকটে গিয়া দেখিল যুবক অর্দ্ধক্ষিপ্ত, তাহার গাত্রে ছিন্ন বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ মলিন, কেশগুলি সম্পূর্ণ রুক্ষ ও জটাবদ্ধ। যুবক যে তাহার স্বামী তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আত্মপরিচয় দিল, কিন্তু সে অপ্রতিম রূপ এপ্রকার বিরূপে কিরূপে পরিণত হইল ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া পার্ব্বতীর বাক্যে প্রত্যয় করিল না; তাহাকে হাঁকাইয়া দিল।

পার্ব্বতী স্বামী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া আর স্বামীর নিকটে যাইতে পারিল না, প্রহার ভয়ে তাহার অতি সন্নিকট স্থানে যাইতে না পারিলেও স্বামীকে সর্ব্বদা নয়নে নয়নে রাখিতে লাগিল, এবং স্বামী যেখানে যায় তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার অনুগমন করিতে লাগিল।

ত্রিলোচন গঞ্জিকাসক্ত হওয়াতে ক্রমে অর্দ্ধক্ষিপ্ততা হইতে পূর্ণক্ষিপ্ততাবস্থায় উপনীত হইল। শেষে মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া এদেশে ওদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পার্ব্বতী যখন দেখিল স্বামী আর ভিক্ষা করিয়াও জীবিকানির্ব্বাহে সমর্থ নহেন, তখন নিজের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল অধিক পরিমাণে পাক করিয়া স্বামীর নিকটে গিয়া ধরিত। স্বামী কখনও ক্ষুধার জ্বালায় সমস্ত অন্ন খাইয়া ফেলিত, কখন বা সমস্ত ছড়াইয়া ফেলিত, এবং নিজে যেমন উপবাসী থাকিত সেইরূপ পার্ব্বতীকেও উপবাসী রাখিত।

এইরূপ অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে করিতে পার্ব্বতী স্বামীর অনুসরণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইল। ত্রিলোচন বৌবাজারে একটা গঞ্জিকার দোকানের নিকট সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত। অনেকদিন

এই স্থান ছাড়িয়া আর কোথাও যায় নাই। পার্ব্বতী এই সুবিধা পাইয়া শিয়ালদহে এক বাসা বাটীতে দাসীবৃত্তি করিতে লাগিল। সকলের আহারান্তে মধ্যাহ্নকালে পার্ব্বতী প্রায় দুই জনের মত অন্ন চাহিয়া লইত। দুই জনের অন্ন লইয়া তাহা চাপা দিয়া পার্ব্বতী কোথায় চলিয়া যাইত ও অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে এক উন্মত্তকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে অন্নভোজন করাইয়া অবশিষ্ট অন্ন স্বয়ং ভোজন করিত।

বাসার ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণ পার্ব্বতীকে অন্নসংগ্রহান্তে প্রতিদিন কোথায় চলিয়া যাইতে, ও শেষে এক উন্মত্তকে আনিয়া তাহার ভোজনান্তে তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁগো ঝি, এই পাগল কি তোমার কেউ হয়? ইহার ভোজন না হইলে তুমি কিছুতেই খাওনা কেন? এক এক দিন তুমি ইহাকে না পাইলে তোমার অন্ন অমনি পড়িয়া থাকে। ইহার কারণ কি? তখন পার্ব্বতী চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিতে লাগিলেন, "ইনি আমার পরম গুরু স্বামী। যতক্ষণ না জানিতে পারি ইহাঁর আহার হইয়াছে, ততক্ষণ কেমন করিয়া উদরে অন্ন দিব?" এই কথা বলিতে বলিতে পার্ব্বতী বাল্যকাল হইতে সেদিন পর্য্যন্ত দশ বৎসর স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিরূপে বেড়াইতেছেন তাহা বর্ণন করিতে লাগিলেন এবং সমুপাগত ব্যক্তিবৃন্দের মনে এমন একটা প্রতীতি জন্মাইয়া দিলেন যে পার্ব্বতী সামান্য ললনা নহেন, ইনি স্বয়ং সাক্ষাৎ পার্ব্বতীই হইবেন।

কিয়ৎ দিবস পরে পার্ব্বতীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না, ইহাতে সকলেই অনুমান করিলেন, উন্মত্ত বোধ হয় কলিকাতা ছাড়িয়া অন্য কোনও স্থানে চলিয়া গিয়াছে, কাজেই পার্ব্বতীও তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। পার্ব্বতী ও তাঁহার স্বামীর শেষে কি ঘটিল জানিতে বড়ই আগ্রহ হয়। কিন্তু তাহা কেহই বলিতে পারে নাই। পার্ব্বতি, তুমি জাতিতে কুম্ভকার হইলে কি হইবে, তুমি যে যে দেশ স্বামীর শুশ্রূষার্থ

তাহার অনুসরণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছ সমস্ত দেশ তোমার পদরেণুতে পবিত্র হইয়া গিয়াছে। বঙ্গভূমি তোমার মত অতুল্য রত্ন প্রসব করিয়া আজ সমুদায় ভূমণ্ডলে পূজ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

স্বামীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ।

পূর্ব্বে রাঢ়দেশে অনেক ভদ্রবংশের লোক দস্যুর ব্যবসায় করিত। সামান্য পয়সার জন্য মনুষ্য বধ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নিজের পুত্রকেও চিনিতে না পারিয়া অর্থের লোভে তাহার প্রাণনাশ করিয়াছে। লোকহত্যা করিয়া তাহার নিকট হয়ত একটী মাত্র আধ্‌লা পয়সা পাইয়াছে, তথাপি এই দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় নাই।

ভবতারণ নামে একটী যুবক রাঢ়দেশে বিবাহ করে। সে বিবাহের পর বিদেশে গিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জনান্তে রাঢ়দেশে শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বামীকে অর্থসহ উপস্থিত হইতে দেখিয়া বালিকাপত্নীর প্রাণ উড়িয়া গেল। বালিকার নাম অম্বিকা। অম্বিকা জানিত তাহার ভ্রাতা দস্যুদলে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং স্বামীর প্রাণ সংশয় ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। 'কিন্তু এখন অস্থির হইবার সময় নয়, স্বামীকে কোনও রূপে বাঁচাইতে হইবে' ভাবিয়া উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

ক্রমে অম্বিকা দেখিল, তাহার স্বামীর প্রাণবিনাশের জন্য পাড়ার সকলে পরামর্শ করিতেছে, তখন অম্বিকা দাদার পায়ে ধরিয়া বলিল, 'দাদা, তুমি সমুদয় অর্থ গ্রহণ কর, আমার স্বামীর প্রাণহন্তা হইও না।' ইহাতে অম্বিকার ভ্রাতা হাস্য করিয়া বলিল, "আরে বোকা, আমি ভবতারণের সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া ছাড়িয়া দিলে কি আমাদের নিষ্কৃতি আছে? ভবতারণ রাজদ্বারে জানাইয়া আমাদের হাতে দড়ি দিবে। ভগ্নি, তুমি অন্যায় অনুরোধ করিও না।"

অম্বিকা যখন দেখিল, তাহার ক্রন্দনে ভ্রাতার প্রাণ গলিল না তখন

নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া স্বামীর প্রাণ বাঁচাইতে সচেষ্ট হইল। অম্বিকা ভ্রাতার পায়ে ধরিয়া বলিল, 'দাদা, আমার সম্মুখে আমার স্বামীর প্রাণনাশ করিও না। স্বামী ঘুমাইয়া পড়িলে আমাকে ঐ স্থান হইতে সরাইয়া দিয়া পরে তাহাকে বিনষ্ট করিও। আমি স্বামিবধ দেখিতে পারিব না।' ভগ্নীর এই বাক্যে ভ্রাতা স্বীকৃত হইল, 'অম্বিকা শয়নগৃহে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ব্যাপার জানাইল।

ভবতারণ কাঁপিতে লাগিল। অম্বিকা তাহাকে অভয় দিয়া বলিল, 'তোমার ভয় নাই। আমি তোমাকে উপস্থিত দেখিয়া অবধি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবার মানসে বাটীর মধ্যে প্রচার করিয়াছি, আমার আমাশয় রোগ হইয়াছে। এই ছল্ করিয়া আমি ঘটি হাতে করিয়া বার বার গৃহের বাহিরে যাইতেছি। সকলে ভাবিতেছে আমার আমাশয় হইয়াছে বলিয়া বার বার খিড়কির ঘাটে যাইতেছি। পাছে তুমি পলাও সেই জন্য লোক জন সকল দিকেই চৌকি দিতেছে, কেবল খিড়কির দিকে আমি বাহিরে যাইতেছি বলিয়া সেই দিকে বেটাছেলে যাইতে বারণ হইয়াছে। আমি তোমাকে আমার শাড়ি.কাপড় ও গহনা দিতেছি তুমি আমার বেশ ধরিয়া ঘটি হাতে করিয়া খিড়কির দিকে গিয়া বেগে ছুটিয়া পলাইতে থাক, এবং যতক্ষণ না থানা মিলিবে ততক্ষণ দৌড়িতে থামিও না। থানাতে আশ্রয় লইয়া রাত্রি কাটাইবে ও পরদিন প্রত্যুষে দেশে চলিয়া যাইবে। আমি যদি এই দুর্দ্দান্ত দস্যুদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, স্বয়ং তোমার বাটী উপস্থিত হইব, নতুবা এই শেষ দর্শন, বলিয়া চরণ প্রান্তে পড়িয়া অশ্রুজলে ধরা ভাসাইতে লাগিল।

স্বামী পত্নীর বাক্যে কাতর হইল, কিন্তু ভগ্নীবধ কেন করিবে, ভাবিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। পরে শাড়ী ও গহনা পরিয়া অবগুণ্ঠনবতী নারীর ন্যায় গৃহ হইতে ঘটি হাতে বাহির হইল ও খিড়কির দিক্ হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল।

দস্যুগণ ভাবিল অম্বিকা আমাশয় রোগের জন্য বাহিরে গিয়াছে, এই সময়ে তাহার অগোচরে স্বামীকে হত্যা করাই সুবিধা। এই ভাবিয়া একজন গৃহমধ্যে দেখিতে গেল সত্য সত্যই ভবতারণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কি না? অম্বিকা প্রদীপের আলো মিট্‌মিটে করিয়া রাখিয়াছিল ও স্বয়ং স্বামীর পোযাক পরিয়া শয়ন করিয়াছিল। দস্যুগণ বুঝিল, ভবতারণই শয্যায় শয়ান আছে, সুতরাং কাল বিলম্ব না করিয়া তাহার বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। অম্বিকা ভাবিল, 'দস্যুগণ যদি আমাকে চিনিতে পারে তাহা হইলে এখনই স্বামীর অন্বেষণে চারিদিকে ছুটিবে ও তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে, সুতরাং আত্মপরিচয় দিব না। স্বামীর প্রাণরক্ষা করিতে নিজের প্রাণ বলিদান দেওয়াই শ্রেয়ঃ" এই ভাবিয়া যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন এই ভাব দেখাইতে লাগিল ও মৃত্যুকালে যে ভাবে জগদম্বাকে ডাকিতে হয় সেই ভাবে ডাকিতে লাগিল।

দস্যুগণ বিশেষ সুযোগ বুঝিয়া তরবারি দ্বারা ভগ্নীর শিরশ্ছেদ করিতে যাইতেছে, একজন বলিয়া ফেলিল 'অম্বিকা বাহির হইতে এখনই আসিয়া পড়িবে, তাহাকে এঘরে আসিতে দেওয়া হইবে না, তাহাকে অন্য গৃহে লইয়া গিয়া পরে ভবতারণের মস্তক ছেদন করা হইবে।'

তাহারা অম্বিকাই গৃহের বাহিরে গিয়াছে মনে করিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু অম্বিকা আর ফিরিল না। "অম্বিকা এত বিলম্ব করিতেছে কেন? দেখ্ দেখি তাহার অসুখ বুঝি বাড়িয়াছে।" খিড়কির দিকে গিয়া দেখিল ঘটী পড়িয়া আছে, অম্বিকা নাই। 'অম্বিকা কোথায় যাইল, দেখ্ দেখ্ সে বুঝি স্বামীর শোকে জলে ঝাঁপ দিয়াছে।' তখন তাহারা ভবতারণের প্রাণ বিনাশে বিরত হইয়া পুষ্করিণীতে নামিয়া অম্বিকাকে খুঁজিতে লাগিল। ক্রমে নিশার অবসান হইয়া আসিল, তখন অম্বিকা স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "দাদা, এই যে আমি। আমি জলে ঝাঁপ দি নাই, বাচিয়া

আছি।” দস্যুভ্রাতা ভগ্নীকে পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল, এবং স্থির করিল অদ্য নিশার অবসান হইয়াছে, কল্যই ভবতারণের প্রাণ বিনাশ করিব। কিন্তু শেষে যখন জানিতে পারিল ভবতারণ সমস্ত টাকা কড়ি লইয়া পলায়ন করিয়াছে, তখন তাহাদের বিষাদের আর সীমা রহিল না। “কিরূপে পলাইল ? বোধ হয় আমরা অম্বিকাকে জলে অন্বেষণ করিতেছিলাম, সেই সুযোগে পলায়ন করিয়াছে।”

অম্বিকা পূর্ব্বে প্রাণে হতাশ হইয়াছিল এক্ষণে, জগদম্বাকে প্রাণের মধ্যে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, “মা, তুমি যে কেবল আমার স্বামীকে বাঁচাইলে তাহা নহে, এই হতভাগিনীর প্রাণও রক্ষা করিলে। মা, বিপদে যে তোমার শরণ লয়, তাহাকে তুমি এইরূপেই রক্ষা কর। আমার প্রাণ ত গিয়াছিল, তুমি দস্যুর মনে কি এক ভাবের উদয় করিয়া আমারও প্রাণ বাঁচাইলে। মাগো, তুমি যথার্থই বিপত্তারিণী, তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে কাহারও কোনও ভয় থাকে না।”

সর্ব্বাবস্থায় পত্নীর অনুকূলতা।

ইছাপুর গোবরডাঙায় চৌধুরীবংশীয় এক জমিদার প্রভূত ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি কলিকাতায় পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যাইত। তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রজাদিগের পরম আদরের বস্তু ছিলেন। প্রজাদিগের টাকা কড়ি জমাইতে ইচ্ছা হইলে তাহারা উক্ত জমিদার সরকারে জমা দিত এবং যখনই প্রয়োজন হইতে আবশ্যকমত চাহিয়া লইত। সুতরাং সভ্রাতৃক জমিদার এক প্রকার দেশের ব্যাঙ্ক হইয়াছিলেন। মাতা অত্যন্ত ধর্ম্মরতা ছিলেন, সন্তান দুইটীও অত্যন্ত মাতৃভক্ত, সুতরাং মাতার শাসনে কোনও প্রকার কু আচার বা কুস্বভাব তাহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারে নাই।

মাতা দুই পুত্রের বিবাহ দিলেন। বধূদ্বয় শ্বশ্রূদেবীর অনুগত থাকাতে সংসারে কখনও বিবাদ বিসংবাদ লক্ষিত হইত না। সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ কলিকাতার দুই একটী ধনবানের সহিত জ্যেষ্ঠের আত্মীয়তা হইল। উক্ত ধনবান্‌গণ আরও অধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন এই আশায় কোম্পানির কাগজের খেলায় আসক্ত ছিলেন। তাঁহারা নূতন বন্ধুকে প্রলুব্ধ করিয়া ঐ ক্রীড়ায় দীক্ষিত করিলেন। বাটীতে মাতা কিংবা কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিছুই জানিতে পারিলেন না। ঐ ক্রীড়া একপ্রকার জুয়াখেলা, সুতরাং জুয়াখেলায় যাহারা আসক্ত হয় তাহাদের শেষে যে দশা ঘটে উক্ত বন্ধুগণের ও ইছাপুরের জমিদারের তাহাই ঘটিল। কলিকাতার উক্ত ধনবান্‌গণ নির্ধন হইলেন, নববন্ধু জমিদার ঋণগ্রস্ত হইলেন। যখন মাতা ও কনিষ্ঠভ্রাতা এই সংবাদ পাইলেন তখন জমিদার একেবারে ঋণ-সাগরে ডুবিয়াছেন ছোট ভাই মনে করিলেই আপনার জমিদারির

অংশ নিজের অধীনে রাখিতে পারিতেন, কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন সমস্ত জমিদারি বিক্রীত না হইলে ঋণ পরিশোধ হইবার নহে, তখন তিনি নিজের অংশ জ্যেষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিলেন ও দারিদ্র্যের দুর্ভর পশরা মাথায় বহিয়া কুটীরে আশ্রয় লইলেন। আজিও তাঁহার কুটীরে বাস ঘুচে নাই। সকল দিন আহার জুটে না। সন্তানগণ ও পত্নী যাঁহারা কখনই দারিদ্র্যের ভীষণ মূর্ত্তি দেখেন নাই, তাঁহাদের এক্ষণে ভিখারীর ন্যায় শুষ্ক দেহ। এক সময়ে যে পুত্রের মুখখানি ঠিক পদ্মফুল বলিয়া ভ্রম হইত এক্ষণে সেই মুখ শুষ্ক ও কালিমায় আচ্ছন্ন। তাঁহাদের এই অবস্থা দেখিয়া যখন আত্মীয়মাত্রেরই প্রাণ ফাটিয়া যায়, তখন না জানি গৃহস্থের নিজের কত কষ্ট!

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, নবদরিদ্রের মুখশ্রীতে তত কষ্টের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। পত্নী ঘরোয়ানা ঘরের কন্যা। স্বামী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্য দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিলেন দেখিয়া তাঁহার স্বামিভক্তি দ্বিগুণিত হইয়াছে। পাছে স্বামী আমার কষ্টে কষ্ট পান সেই ভয়ে কোনও প্রকার কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ করেন না, সর্ব্বদাই হাসিমুখে থাকেন। যখন এই গৃহলক্ষ্মীর চন্দ্রানন চন্দ্র সূর্য্যও দেখিতে পাইতেন না, দাস দাসী পরিবৃত হইয়া রাজ-নন্দিনীর ন্যায় সুখে কালাতিপাত করিতেন তখন তাঁহার মুখে যে হাসি ছিল এক্ষণেও সেই হাসি। স্বামী পত্নীকে একদিনের জন্যও বিমর্ষ দেখিলেন না, সুতরাং কি জন্য দুঃখিত হইবেন? তিনি বলেন, "দাদার সেবা করিতে যদি সমুদ্রেও ঝাঁপ দিতে হয়, যদি বিষও পান করিতে হয় তাহাও যখন করিবার কথা, তখন জীবন না হারাইয়া কেবল দারিদ্র্য দুঃখটাও বহন করিতে পারিব না? ভগবানের কি দয়া! আমাকে পুরস্কার দিবার জন্য তিনি এমন পত্নী দিয়াছেন যে তাঁহার প্রফুল্ল মুখপদ্ম দেখিবামাত্র আমার সমুদায় দারিদ্র্যকষ্ট অপসারিত হয়!"

আত্মার প্রতি সমাদর।

মনুষ্যের আত্মা একটী মহোচ্চ পদার্থ। সাধু ব্যক্তিগণ নিকৃষ্ট জাতীয়ের প্রতি বা পীড়াদিদ্বারা অস্পৃশ্য ব্যক্তির প্রতি সমাদর প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা বলেন, লোকে নিকৃষ্ট জাতিকে বা কুৎসিত পীড়ান্বিতকে যতই হতাদর করুক না, তাহার অন্তর্বর্ত্তী আত্মা সর্ব্বদাই পূজার্হ, সুতরাং সেই আত্মার খাতিরেই তাহার নিকৃষ্ট জাতি বা পীড়াদি দ্বারা অস্পৃশ্যতা না ভুলিয়া থাকিতে পারা যায় না।

১। এক দিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কালনায় হাটিয়া যাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন বলবান্ ছিলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয়ও তদ্রূপ বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা পথে হাঁটিয়া যাইতেছেন, দেখিলেন একটী মুটিয়া মাথার মোট নীচে নামাইয়া তাহার ধারে পড়িয়া আছে। মুটিয়া বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হওয়াতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, উঠিবার সামর্থ্য নাই। পরিধান বস্ত্র বিণ্মূত্রে প্লাবিত হইয়া আছে। পথ দিয়া যেই যাইতেছে, সেই নাকে কাপড় দিয়া সরিয়া যাইতেছে। মুটিয়া চিঁ চিঁ করিয়া যাহারই নিকট করুণার প্রার্থী হইতেছে, সেই পাশ কাটাইয়া পলায়ন করিতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বিদ্যারত্ন মহাশয় মুটিয়াকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের উভয়ের হৃদয় গলিয়া গেল। মুটিয়ার প্রতি ক্ষণেক দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার সেই দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন "আহা! এই অনাথ অশরণ ব্যক্তির পিতা মাতা পুত্র কেহই নিকটে নাই যে, একবিন্দু তৃষ্ণার জল দিয়াও সেবা শুশ্রূষা করিবে। আমাদের পুত্র যদি এই অবস্থায় পড়িত তবে কি হইত! তাহাকে ত এই অবস্থায় পিপাসায় ও রোগের জ্বালায় ছট ফট্ করিয়া

প্রাণ হারাইতে হইত !! আমরা ইহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিব না। আমরা উভয়েই বলিষ্ঠ, এক জন মুটিয়াকে লইব ও আর একজন মোট লইয়া কালনায় উপস্থিত হইয়া ইহার চিকিৎসার ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিব।" এই বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মুটিয়াকে বুকে তুলিয়া লইলেন। মুটিয়ার মাথা নিজের স্কন্ধে রাখিয়া যাহাতে তাহার কোনও কষ্ট না হয় এমন ভাবে রাখিয়া চলিতে লাগিলেন ; বিদ্যারত্ন মহাশয় মুটিয়ার প্রকাণ্ড মোটটী মাথায় করিয়া চলিতে লাগিলেন। "দুইটী ব্রাহ্মণ একটী অস্পৃশ্য মুটিয়াকে কেমন লইয়া যাইতেছে" দেখিবার জন্য পাড়ার লোক ভাঙ্গিয়া আসিল। বৃদ্ধ রমণীগণ বলিতে লাগিল, "ইঁহারা মানুষ নন, দেবতাদ্বয় শাপভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছেন। দেবতা ভিন্ন মানুষে কাজ করিতে পারে না।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বিদ্যারত্ন মহাশয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী কালনায় উপস্থিত হইলেন ও তাহার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া ও সেবার জন্য লোক স্থির করিয়া যত খরচ পত্র হইবে তাহা বিশ্বাসী লোকের হস্তে দিয়া যখন বুঝিলেন, যে মুটের আর অশরণ অবস্থা নাই তখন তাহার নিকট বিদায় লইলেন। বিদায় দিবার সময় মাতা যেরূপ বিদেশগামী পুত্রকে বিদায় দিতে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করেন, মুটিয়া সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়াছিল।

৵২। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত চাঙ্গড়িপোতা নিবাসী কৃষ্ণমোহন শিরোমণি একদিন নৌকাযোগে কোনও আত্মীয়ভবনে গমন করিতে-ছিলেন। সঙ্গে পরিবারস্থ কয়েকটী স্ত্রীলোকও ছিলেন। নৌকায় অতি নিকৃষ্ট জাতীয় যে সকল মাল্লা ছিল তাহাদের একটী শিশুও ঐ নৌকায় ছিল। শিশুটী অত্যন্ত চীৎকার করিতেছিল। চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল তাহার মা নাই সুতরাং তেমন যত্ন করিবার কেহ নাই বলিয়া শিশুর কষ্ট হইয়াছে, তাই কাঁদিতেছে। এই

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাক্যে শিরোমণি মহাশয়ের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন ছেলেটীর চক্ষু দুইটী পিঁচুটীতে জোড়া লাগিয়া আছে, সেই জন্য আরও চীৎকার করিতেছে। তিনি থাকিতে পারিলেন না। পুত্রটীকে কোলে করিয়া লইবার উপক্রম করিলেন। মেয়েরা, "হাঁ, হাঁ, করেন কি? করেন কি? ওযে কাওরার ছেলে, ছুঁইলে যে স্নান করিতে হইবে" ইত্যাদি বলিলেও শিরোমণি মহাশয় ছেলেটীকে কোলে তুলিয়া লইলেন ও নিজে যে মূল্যবান্ গরদ বস্ত্র পরিয়া ছিলেন, সেই কোমল রেশম বস্ত্রের প্রান্ত জলে ভিজাইয়া ছেলেটীর চক্ষু পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিলেন। চক্ষু পিঁচুটীশূন্য হওয়াতে বালকটী শিরোমণি মহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখে হাসির চিহ্ন দেখা দিল। শিরোমণি মহাশয়ও, "বালকের এ হাস্য ত হাস্য নয়, ইহা স্বর্গীয় ধন। স্বর্গীয় বালক, আমি যে তাহার সেবা করিলাম, তাহার পারিতোষিক দান করিবার জন্যই আমাকে স্বর্গীয় হাস্যে আনন্দিত করিতেছে" বলিয়া, যেন সুরলোকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকগণ তাঁহার অতুল আনন্দ দেখিয়া নিজেরা অপ্রস্তুত হইলেন।

৩। রাজনারায়ণ বসু যখন দেওঘরে অবস্থান করিতেন, তখন বহু-লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তিনি কি ধনী কি দরিদ্র, কি উচ্চবংশীয় কি নীচবংশীয় সকলকেই সমভাবে অভ্যর্থনা করিতেন।

একদিন কয়েকটী ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহাদের মধ্যে একজনের গলিত কুষ্ঠ রোগ ছিল। তিনি একটু দূরে থাকিয়াই রাজনারায়ণ বাবুকে নমস্কার করিয়া উপবেশন করিলেন। রাজনারায়ণ বাবু সমুপাগত সমস্ত ব্যক্তিকেই স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। পরে যখন সেই কুষ্ঠীর দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন কুষ্ঠী মলিনমুখে বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয়, আমার নিকট আসিবেন না, আমি কুষ্ঠী, আমার সমস্ত অঙ্গ পচিয়া যাইতেছে, ইহাতে এমন দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে যে ইহার

আঘ্রাণে আপনার বমন হইবার সম্ভাবনা।' রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার এই সমস্ত বাক্য যেন শুনিতে পাইলেন না, এই ভাব দেখাইয়া তাঁহাকে এমন দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন যেন সকলের মনে হইতে লাগিল "এটী রাজনারায়ণ বাবুর পুত্র, বহুকাল পরে বিদেশ হইতে আসিয়া পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। পিতাও সহসা ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছেন না।" কুষ্ঠী ব্যক্তির চক্ষের জল আসিল, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি মানুষের অস্পৃশ্য বটে কিন্তু দেবতার অস্পৃশ্য নহি। মানুষের মনে ঘৃণা আছে, কিন্তু দেবতারা ঘৃণাশূন্য।

ভ্রাতৃদ্বয়ে পরস্পর নির্ভরতা।

চিন্তামণি ও শশিভূষণ।

ডায়মণ্ড হারবারের নিকট হটুগঞ্জ গ্রামে মহারাজ নরেন্দ্র কৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর গত হইল, ঐ বিদ্যালয়ে চিন্তামণি সরকার নামে একটী অতি দরিদ্র বালক প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। বালকটীকে অতি মেধাবী, সরল ও সৎস্বভাব দেখিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাহার প্রতি স্নেহপরায়ণ হন। চিন্তামণির এমন সঙ্গতি ছিল না যে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে, সুতরাং আত্মীয় ব্যক্তিগণ যেরূপ সাহায্য করিতে পারিতেন তদনুরূপ পুস্তকাদি ক্রয় করিত।

চিন্তামণি অতি কষ্টে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল ও তাহাতে কৃতকার্য্য হইল। এক্ষণে চিন্তামণি ভাবিল আমি যতটুকু শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিলে দশ পনর টাকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইব। আমার কনিষ্ঠ অতি বুদ্ধিমান্ তাহাকে এক্ষণে

শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া নিজে মধ্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইয়া কর্ম্ম করিতে লাগিল ও কনিষ্ঠের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিল। কনিষ্ঠ শশিভূষণ পাঠে মনোনিবেশ করিয়া অতি অল্প কাল মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল ও তাহাতে কতকার্য্য হইল। চিন্তামণি শশিভূষণকে পাঠে বিরত না করিয়া পরবর্ত্তিপরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইবার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিল। শশিভূষণ উচ্চ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া এক্ষণে দাদাকে উচ্চ পরীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ও স্বয়ং কর্ম্মকাজ করিয়া তাঁহার পাঠের ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিল। অন্যের গলগ্রহ না হইয়া বা ভিক্ষা না করিয়া দুই ভাই এইরূপ চাকরি দ্বারা পরস্পরের সাহায্য করিতে করিতে শেষে বি, এল্, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া দুই জনেই ওকালতি করিতেছেন। এক্ষণে সেই পূর্ব্বের দৈন্যাবস্থা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। উভয়েই বহুলধনোপার্জ্জনে সমর্থ হইয়া স্বদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ভাই ভাইয়ে পরস্পরের সাহায্যে সংসারের যে কত উন্নতি করিতে পারা যায় তাহার প্রমাণ দিয়া বাঙ্গালাদেশের উজ্জ্বল রত্নরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

সংসর্গগুণে অবস্থার পরিবর্ত্তন।

একটী ভদ্রসন্তান ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষান্তে বাঙ্গালায় ডাক্তারি পরীক্ষা দিয়া এক মহকুমায় ৩০৲ টাকা বেতনে গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিতে যান। সেই মহকুমায় অনেকগুলি বাঙ্গালী কাজ করিতেন। কেহ মুন্সিফ, কেহ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, কেহ সব্ জজ্, কেহ এঞ্জিনিয়ার, কেহ বা পুলীসের অধ্যক্ষ ছিলেন। ডাক্তার বাবুর সহিত তাঁহাদের সকলেরই পরিচয় হওয়াতে তাঁহারা সকলেই তাঁহার খাতির করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু তাঁহাদের আদরে কিঞ্চিৎ জড়সড় হইতেন। সকলেই কেহ চারিশত টাকা, কেহ পাঁচশত টাকা, কেহ সাতশত টাকা, বেতন পান, কেবল ডাক্তার বাবু ৩০৲ ত্রিশ টাকা মাত্র বেতন পান, সুতরাং যখনই তাঁহারা ডাক্তার বাবুকে খাতির করিয়া উঁহাদের সহিত একাসনে বসাইতেন, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের সময় সমভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন, তখনই ডাক্তার বাবু নিজের অবস্থা তাঁহাদের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া কুণ্ঠিত হইতেন।

তিনি এরূপ ভাবে কতকাল কাটাইবেন? অত বড় বড় লোকের সংসর্গে কত কাল কুণ্ঠিত ভাবে কাটাইবেন? শেষে স্থির করিলেন, "যদি কখনও আমি সমকক্ষ হইতে পারি তবেই উঁহাদের সহিত মিশিব, অন্যথা উঁহাদের সংসর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিব।"

মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া, ডাক্তার বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রতিদিন গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাপন করিয়া কেবল পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার সেই উৎসাহে কে বাধা দিবে? যে দৈববাধা আসিয়া পড়িত তাহাও তাঁহাকে

উদ্যম হইতে বিরত করিতে পারিত না। দুই এক বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার যোগ্য হইলেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছুদিন অবকাশ লইয়া পরীক্ষা দিলেন ও অবকাশান্তে পুনরায় মহকুমায় গিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। পরীক্ষায় কৃতকৃত্যদিগের নামের সহিত তাঁহারও নাম বাহির হইল। তিনি দ্বিগুণিত উৎসাহের সহিত এল্, এ, পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মহকুমায় যে ইংরাজি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল তাহার প্রধান শিক্ষকের সহিত বিশেষ আত্মীয়তা থাকাতে, তাঁহার পাঠের কোনও ব্যাঘাত ঘটিল না। সত্বর এল্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

এল্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, এম্, বি, পরীক্ষা দিবার জন্য মেডিকেল কলেজে পড়িবার সাধ হইল বটে, কিন্তু দেখিলেন কাজকর্ম্ম করিতে করিতে বি, এ, পাঠ হইতে পারে কিন্তু চাকরি না ছাড়িলে মেডিকেল্ কলেজে পড়িবার যো নাই। সুতরাং তিনি এ সংকল্প ছাড়িয়া বি, এ, ও শেষে বি, এল্, পরীক্ষা দিতেই বাধ্য হইলেন ও তাহাতে যথা সময়ে কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি ডাক্তারি ছাড়িয়া ঐ মহকুমাতেই একজন উকিল হইলেন ও পূর্ব্ব বন্ধুদিগের সহিত অকুণ্ঠিত ভাবে মিশিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের সহিত নিজের অবস্থার সমতা দেখিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন, এবং উদ্যমের কাছে মানুষের কিছুই অসম্ভব নয়, দেখিয়া উদ্যমদাতা ভগবানের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হইয়া রহিলেন।

সমাজের প্রকৃত শিক্ষক।

দোষের দূরীকরণ দ্বারা যিনি সমাজের উন্নতি বিধান করেন, তিনিই প্রকৃত মহান্ শিক্ষক। থিয়োডোর্ পার্কার্ কৃতদাসের প্রতি অত্যাচার নিবারণ দ্বারা ইউরোপীয় সমাজের উন্নতি করেন, সুতরাং থিয়োডোর্ পার্কারের ন্যায় মহান্ শিক্ষক জগতে বিরল। অস্মদ্দেশীয় মহর্ষিগণ সমাজের যখনই অধর্ম্মভাব, নীচতা, স্বার্থপ্রবণতা দেখিতেন, তখনই তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার নিবারণ করিতেন। তাঁহাদের প্রতাপে প্রবল দোষ সমাজে তিষ্ঠিতে পারিত না। মদ্যপান সমাজে প্রচলিত হইবামাত্র তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে এমন কঠোর নিয়ম নিবদ্ধ করিলেন যে, সমাজে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইলে, তাহা প্রতি-পালন ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। তাঁহাদের শিক্ষার প্রভাবে বহুলোকে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও মাদক দ্রব্য সংযুক্ত ঔষধ পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না। বিবাহকালে কন্যা-শুল্ক-প্রথা যেমন প্রবল হইতে লাগিল, অমনি ঋষিগণ কন্যাবিক্রয়ীদিগের অনন্ত নরক ঘোষণা করাতে সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন ও দুষ্প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ প্রথা নীচ জাতীয়গণের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেন, উচ্চ জাতীয়দিগের নিকটেই আসিতে দিলেন না।

এক্ষণে কন্যাপক্ষ হইতে যৌতুকগ্রহণরূপ কুপ্রথা এমন প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহার বিরুদ্ধে মহর্ষিগণ না দাঁড়াইলে বর্ত্তমান উন্নত সমাজ নীচসমাজে পরিণত হইবে ও পাপের ভরে ডুবিয়া যাইবে। বর্ত্তমানকালে সে মহর্ষি কৈ? সে শিক্ষাই বা কৈ?

যিনি পরের দুঃখ দেখিয়া অশ্রুপাত করেন, পরের দুঃখ নিবারণার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেন, তাঁহাকে মহর্ষিশ্রেণী মধ্যে গণনা না করিয়া থাকা যায় না।

১। স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন মহর্ষি। তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ কৃতবিদ্য হইয়া ভবানীপুরে থাকিয়া চিকিৎসা-চর্চ্চায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের অবস্থা ভাল, ডাক্তারকে অর্থ দিতে কোনও কষ্ট হইত না, কেবল তাঁহাদেরই নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেন, দুঃস্থ ব্যক্তি জানিতে পারিলে কেবল যে অর্থ গ্রহণ করিতেন না, তাহা নহে, ঔষধাদি বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন।

এক দিন তিনি এক দরিদ্র ভবনে একটী বালকের সঙ্কট রোগের চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া তাহার রোগ পরীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় অস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইলেন, "বলয় বন্ধক দিয়া যে টাকা পাইবার কথা ছিল তাহা এখনও পাওয়া গেল না, তাই ত, ডাক্তার বাবুর টাকার কি করা যায়?" ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের কর্ণে যে মূহূর্ত্তে এই অস্ফুটধ্বনি প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি রোগের ব্যবস্থা পত্রে একটী সঙ্কেত করিয়া লিখিয়া দিলেন, "বিনা মূল্যে।" পরে তিনি বিদায় লইবার সময় বলিয়া দিলেন, "এই বালকের চিকিৎসার জন্য তোমাদের ডাক্তারের খরচ বা ঔষধের খরচ কিছুই লাগিবে না।" বালকের পিতা মাতা আনন্দের উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিলেন, কিন্তু ডাক্তার মহোদয়ের সেই দিন আনন্দের সীমা রহিল না, প্রায় একমাস চিকিৎসার পরে, যেদিন তাহাকে অন্নপথ্য দিলেন।

শ্রীমান্ স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পাঠাবস্থায় এমন খ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন যে, অনেক ধনবান্ ব্যক্তির চক্ষু ইঁহার উপর পতিত হইল। এনট্রান্স্, এল্, এ; বি, এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করাতে কোনও প্রসিদ্ধ ধনবান্ ব্যবহারাজীব ইঁহার বি, এ পরীক্ষার পরেই ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, মহাশয়, আপনার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবার অত্যন্ত সাধ হইয়াছে।

আপনার পুত্র যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইনি আইন ব্যবসায়েও অদ্বিতীয় হইবেন। তখন যাহাতে ইঁহার ব্যবহারাজীবের কার্য্যে উন্নতি হয়, আমি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। আপাততঃ ইঁহার বিবাহে ত্রিশ হাজার টাকা যৌতুক দিতেছি।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের তৎকালে যেরূপ অবস্থা তাহাতে বিবাহের প্রস্তাবকারী ভাবিয়াছিলেন, আমার এই প্রস্তাব কিছুতেই অগ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু ডাক্তার মহাশয় এই প্রস্তাবে মনে মনে হাস্য করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আমি পুত্রবিক্রয়ী হইতে পারিব না। আমার বড়ই সাধ, আমি একটী দরিদ্র সাধুচরিত্র সুপণ্ডিতের কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিব। তিনি তাঁহার কন্যাকে দুইগাছি রুলি দিয়া বিবাহ দিলে সেই কন্যাকে যেরূপ সালঙ্কারা মনে করিব, সোণা ও জহরতে মুড়িয়া দিলেও তেমন মনে করিব না।"

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ বাক্যে যাহা বলিলেন, কাজেও তাহা দেখাইয়া বঙ্গীয় সমাজকে কতই না সুশিক্ষা দিলেন!

তৎকালে ত্রিশ হাজার টাকা এক্ষণকার লক্ষ মুদ্রার সমান। যিনি সমাজকে সুশিক্ষা দিবার জন্য লক্ষ টাকা লক্ষ্যেও না আনেন, তাঁহাকে মহর্ষি না বলিয়া কিরূপে থাকা যায়!

২। ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার মধ্যে মূলটী গ্রামে মাননীয় জমিদার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দে মহাশয়কে মহর্ষি-শ্রেণীর মধ্যে গণনা করিতে ইচ্ছা হয়।

ইনি দেখিলেন, আর্য্যসমাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌরব লাভ করিয়াও একটী দোষের আশ্রয় লইয়া নরকে ডুবিতে বসিয়াছে। বরপক্ষীয়গণ কন্যাপক্ষীয়দিগকে নিপীড়িত করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না। কন্যাপক্ষীয়গণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও বরপক্ষীয়দিগের

গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

হৃদয়ে অনুকম্পার সঞ্চার করিতে পারিতেছেন না। মহাত্মা কৈলাসচন্দ্র কন্যাপক্ষীয়দিগের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদের দুঃখ যতই ভাবিতে লাগিলেন, যতই নির্জ্জনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই, কি উপায়ে সমাজের এই দুর্নীতি দূর করিতে পারা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তাহার মূল্যের সীমা থাকে না, দেখিয়া, তিনি নিজ পুত্রকে ঐ তিনটী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য করিলেন এবং বিবাহ দিবেন এই ঘোষণা করিয়া বর্ত্তমান দুর্দ্দশাপন্ন সমাজের সুশিক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন।

রাজযজ্ঞেশ্বর মিত্র মহাত্মা কৈলাসচন্দ্র দের-পুত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়া ভয়ে ভয়ে ভাবিতে লাগিলেন, কৈলাসচন্দ্র একে ধনবান্ জমিদার, তাহাতে তাঁহার পুত্র বি, এ, উপাধিধারী, না জানি কতই যৌতুক চাহিবেন।" শেষে সাহসে নির্ভর করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "মহাশয়, আপনার পুত্রকে কিরূপ যৌতুক দিতে হইবে ?"

মহোদয় কৈলাসচন্দ্র সমাজের সুশিক্ষার সুবিধা পাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনাকে আর কিছুই দিতে হইবে না, দিতে হইবে কেবল একটী বাক্য।"

রাজযজ্ঞেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বাক্য কি ?"

মহাত্মা কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "আমাদের আর্য্যসমাজ যদি রক্ষা করিতে চান, যদি ইহাকে নরকে ডুবাইতে না চান, তবে একটী বাক্যে আবদ্ধ হউন। আমার পুত্রকে একটী পয়সাও যৌতুক দিতে পারিবেন না। আপনার কন্যাকে একখানি লাল শাটী ও এক যোড়া রুলি মাত্র দ্বারা সালঙ্কারা করিয়া দান করিবেন। দশ পনর জন মাত্র যে বরযাত্রী যাইবে তাহাদিগকে অতি সামান্য আহার দিবেন, কিন্তু এই 'বাক্যে' আবদ্ধ হইতে হইবে যে আপনার তিন পুত্রের বিবাহের সময় কন্যাপক্ষীয়দিগের প্রতি

ঠিক এই ব্যবহার করিবেন।" রাজযজ্ঞেশ্বর এই বাক্যে নিস্পন্দভাবে বাবু কৈলাসচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষে কৈলাসচন্দ্র আর মানুষ বলিয়া বোধ হইল না। সমাজের শিক্ষা দিতে হইলে যে এইরূপেই শিক্ষা দিতে হয় তাহা তিনি অনুভব করিয়া কৈলাসচন্দ্রকে বার বার মনে মনে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং তিনিও এই দৃষ্টান্তানুসারে কার্য্য করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বিনা ব্যয়ভারে কন্যার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

৩। বিশ্বস্তসূত্রে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে কলিকাতায় আহিরিটোলার নিকটবর্ত্তী স্থানে এক ব্যক্তি নিজ কৃতবিদ্য পুত্রের বিবাহার্থ এক কন্যা দেখেন ও মনোনীত করেন। কন্যাকর্ত্তাও মনোমত পাত্র পাইয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া বরকর্ত্তা যৌতুকস্বরূপ যত অর্থ চাহিলেন তাহা ভদ্রাসন বন্ধক দিয়াও দিতে মনন করিলেন। আমার গুণবতী সুন্দরী কন্যা গুণবান্ ভর্ত্তা পাইলে মণিকাঞ্চনের যোগ হইবে ভাবিয়া তিনি নিজের ভদ্রাসনের মায়া ত্যাগ করিলেন, এবং উহা বন্ধক দিবার জন্য উত্তমর্ণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল, উত্তমর্ণ বরকর্ত্তাকে দেয় সমুদয় অর্থ একেবারে দিতে পারিবেন না, অর্দ্ধেক দিবেন ও দুই একদিন পরে অপরার্দ্ধ দিয়া লেখা পড়া করিয়া লইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। উত্তমর্ণ এই সংবাদ বিবাহের দিন কন্যাকর্ত্তাকে দিলেন। কন্যাকর্ত্তা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কারণ, বরকর্ত্তা যদি তাহাতে সম্মত না হন তাহা হইলে বিবাহে ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। উত্তমর্ণ তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন "আমি যখন টাকা দিবার দায়িত্ব লইতেছি, তখন বরকর্ত্তা আমারই নিকট হইতে আদায় করিবেন, আপনি ভয় করিবেন না।"

যাহা হউক কন্যাকর্ত্তা ভয়ে ভয়ে বিবাহে যে সকল বরযাত্রী উপস্থিত হইবেন তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ নানা আয়োজন করিতে লাগিলেন। যথা-

সময়ে বরকর্ত্তা ও বরযাত্রিগণ বাদ্য বাজনার সহিত বর আনয়ন করিলেন। কন্যাকর্ত্তা জড়সড় ও অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। ক্রমে লগ্নকাল উপস্থিত হইল। কন্যাকর্ত্তা লগ্ন উপস্থিত দেখিয়া বরকর্ত্তার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন, বৈবাহিক মহাশয়, লগ্ন উপস্থিত, পাত্রকে বিবাহ স্থানে লইয়া যাই? বরকর্ত্তা উত্তর করিলেন "অগ্রে আমাকে দানসামগ্রী ও নগদ টাকা দেখাও পরে পাত্র লইয়া যাইও।" এই বাক্যে কন্যাকর্ত্তার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল! এই সময়ে কন্যাকর্ত্তার উত্তমর্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও বরকর্ত্তাকে সবিনয়ে বলিলেন মহাশয়, আপনার বৈবহিক আমারই নিকট ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া টাকা লইয়াছেন। পার্ব্বণে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকাতে সকল টাকা দিতে পারি নাই। কল্য না হয় পরশ্বঃ আমারই নিকট হইতে টাকাটা পাইবেন। এই বাক্য শুনিয়া বরকর্ত্তা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিলেন, এবং উত্তমর্ণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বরযাত্রীদিগকে অনুরোধ করিলেন "পাত্র উঠাও, এখানে বিবাহ দেওয়া হইবে না।" চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বাটীর ভিতরে কন্যার মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কন্যাকর্ত্তা করযোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইয়া অশ্রুজলে গণ্ডদ্বয় ভাসাইতে লাগিলেন। অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া বরকর্ত্তাকে পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহাশয়, আপনার যাহাতে বিশ্বাস হয় এমন ভাবে আমাদের নিকট হইতে লিখাইয়া লউন, আমরা আপনার টাকার জন্য দায়ী থাকিতেছি।

অনেক পীড়াপীড়ি করাতে শেষে বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তাকে একটা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে বলিলেন। ষ্ট্যাম্প আনিবার জন্য চারিদিকে দয়ালু ব্যক্তিগণ ছুটিলেন ও অত রাত্রে ষ্ট্যাম্পের যোগাড় করিয়া লেখা পড়া করিবার সহায়তা করিলেন। হ্যাণ্ডনোট লেখা হইল, কন্যাকর্ত্তা বরে কন্যা সম্প্রদান করিতে অনুমতি পাইলেন।

অতঃপর শান্তিতে রাত্রি কাটিয়া গেল। সূর্য্যদেব তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যভার সম্পাদনার্থ অনুরাগ প্রদর্শন করাতে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল। "অদ্য বর নবোঢ়া বালা সঙ্গে লইয়া পিতৃভবন আলোকিত করিবে" পিতা এই আনন্দে বরের গৃহ প্রত্যাগমনার্থ আয়োজন করিতে লাগিলেন। আবার বাদ্য বজনা আরম্ভ হইল, সমুদায় প্রস্তুত, কিন্তু বর অন্দর মহলে বসিয়া আছেন কিছুতেই বাহিরে আসিলেন না। "একি ? বারবেলা উপস্থিত, বর বাহিরে আসিতে চাহেনা কেন ? তাহার কি কোনও অসুখ হইয়াছে ?" পিতা ব্যস্ত হইয়া অন্দরে বালক পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু বরের মুখে কোনও কথা নাই, সে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। শেষে বরের পিতা ব্যস্ত হইয়া অন্দরেই প্রবেশ করিলেন ও ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা, তোমার কি কোনও অসুখ হইয়াছে ?

পুত্র পিতাকে দেখিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল ও তাঁহার পদ ধূলি লইয়া বলিতে লাগিল, "পিতঃ, আমি কোথায় যাইব ?"

পিতা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "বাড়ী যাইবে, ইহা কি ভুলিয়া গিয়াছ ?" বারবেলা উপস্থিত, শীঘ্র বাহিরে চল।"

তখন পুত্র করযোড়ে মুখ নত করিয়া বলিতে লাগিল, "পিতঃ, আমিত বাড়ীতেই আছি ! কল্য হইতে আমার বাড়ীত এই বাড়ীই হইয়াছে। আপনি যখন আমায় বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ লইয়াছেন, তখন আপনি ত আমাকে দাসবৎ বিক্রয় করিয়াছেন, আমি এক্ষণে ইঁহাদের ক্রীতদাস।"

পিতা বালকের কথায় আড়ষ্ট। এদিকে ক্রোধে গস্ গস্ করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু জবাব কি দিবেন ভাবিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। কেবল মধ্যে মধ্যে মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল, "আজিকার ছেলেগুলোকে লেখাপড়া শিখাইয়া জেঠা করিয়া তুলা হইয়াছে। ইহাদের হইতে আর আমাদের কোনও ভরসা নাই।" শেষে অনন্যোপায় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তবে কি চাহ ?"

· পুত্র সবিনয়ে বলিলেন "যে সমস্ত টাকা লইয়াছেন, সমস্ত ফিরাইয়া দিলে বাটী যাইতে পারি।

পিতার ক্রোধের সীমা রহিল না। "হাতের লক্ষ্মী যাহারা পা দিয়া ঠেলিতে পারে তাহাদের চিরকাল কষ্ট পাইতে হইবে। আমার কি? আমিত জীবনলীলা একপ্রকার শেষ করিয়াছি, তুমি যাহাতে অর্থকষ্ট না পাও, সেই জন্য এই সমস্ত চেষ্টা, নিজের ভাল যদি না বুঝ, কষ্ট পাও, আমি মিছে ভাবিয়া কি করিব?" ইত্যাদি বলিতে বলিতে সমস্ত অর্থ কন্যা-কর্ত্তাকে ফিরাইয়া দিলেন। কন্যাকর্ত্তা ও কর্ত্রী "বাবা, আমাদের জন্য তোমার এত ভাবনা?" বলিয়া আনন্দে কাঁদিতে লাগিলেন, এবং "বাবা, তুমি রাজা হইবে, তোমার ঘরে লক্ষ্মী চিরবিরাজ করিবেন" এইরূপ শুভাশীর্ব্বাদ দ্বারা বরের মনে স্বর্গীয় আনন্দের আবির্ভাব করিতে লাগি-লেন। নবোঢ়া বধূ, "আমার জন্য পিতার এত কষ্ট, আমি কেন বিবাহের অগ্রে মরিলাম না" ইত্যাদি বলিয়া অগ্রে মনে মনে কতই ক্ষোভ করিতে-ছিলেন ও অদৃষ্টচর অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে স্বামীর এই প্রথম গুণের বিকাশে স্বামিভক্তিতে গদগদ হইয়া আনন্দবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বশুরালয়ে গমনার্থ এক্ষণে যে বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল তাহা স্বর্গের দুন্দুভি বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

দ্রব্যে সমাদর।

"যাকে রাখ সেই রাখে।"

বাঙ্গালা দেশে বহুকাল প্রচলিত একটী প্রবাদ-বাক্য আছে। "যাকে রাখ, সেই রাখে।" এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া যাঁহারা চলেন, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে "কৃপণ" এই আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহারা যে সংসারে অল্প কষ্ট পান তাহার প্রমাণ সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

১। চব্বিশ পরগণার অন্তর্বর্ত্তী রাজপুর মিউনিসিপালিটিতে গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী নামে, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের এক পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী কখনও কোনও দ্রব্য বৃথা নষ্ট হইতে দিতেন না। পণ্ডিত গঙ্গাধরের অকাল মৃত্যুতে পত্নী দুইটী কন্যা ও একটী নাবালক পুত্র লইয়া অসহায় অবস্থায় পড়িলেন। গিরিশ বিদ্যারত্ন ফণ্ড হইতে যাহা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাইতেন তাহা অবলম্বন করিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। সমস্ত দিনই পরিশ্রম করিতেন। ধান কিনিয়া তাহা হইতে চাউল প্রস্তুত করিতেন। পাট কিনিয়া তাহা পাকাইয়া দড়ি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন। বাড়ীর গাছ গাছড়ার ফলমূল নিজেরা না খাইয়া তাহা বিক্রয় করিতেন। এইরূপে অতি কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিলেন।

একদিন দেখা গেল, তিনি অতি সন্তর্পণে উনানের ছাই এক স্থানে জমাইয়া রাখিতেছেন। যেরূপ যত্নে ছাইগুলি রাখিতেছিলেন তাহাতে সহজেই প্রশ্ন আসিল, হাঁগো, ছাইগুলি অত যত্ন করিয়া রাখিতেছ কেন? তিনি উত্তর করিলেন, "ছাইয়ে কি উপকার হইবে তাহা জানি না। আপাততঃ মনে হইতে পারে, যাহার গরু আছে তাহার ভিজা গোয়ালে এই ছাই দিলে গরুদের কষ্ট হইবে না; কোনও জিনিস নষ্ট করিতে নাই।"

রমণী প্রায় ১৫ বৎসর এইরূপ কষ্টের দশায় থাকিলেন। ক্রমে তাঁহার শুভদিন আসিতে লাগিল। নাবালক ছেলেটী কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়া চাকরি করিতে লাগিল। মাতার তত্ত্বাবধানে শেষে সংসারের অবস্থা এমন সচ্ছল হইল যে, ইষ্টকের গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সামর্থ্য হইল। ইষ্টক প্রস্তুত করিবার সময় অনেক বালি লাগে। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বালি কেন?' পুত্র বলিল "বালিতে ইটের ফরমা না ডুবাইয়া লইলে ইটু ফরমা হইতে ছাড়িবে না।" মাতা বলিলেন, "বালি না দিয়া ছাই দিলে হয় না?" পুত্র তখন উত্তর দিতে পারিলেন না; পরে ইষ্টক-নির্ম্মাণকারকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, ছাই কেহ কখন দেয় নাই, তবে ছাইয়ে বালির সম্পূর্ণ কাজ হইবে।" এই বাক্যে মাতা' লোকদিগকে ছাইয়ের গাঁদা দেখাইয়া দিলেন। পনর বৎসরে ছাইয়ের গাদা প্রকাণ্ড হইয়াছিল, তাহাতে এত ছাই ছিল যে বালি কিনিবার অনেক টাকা বাঁচিয়া গেল। এক্ষণে তাঁহাদের সুদিন আসিয়াছে, সংসারের কোনও কষ্ট নাই।

২। বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও কোনও দ্রব্য নষ্ট হইতে দিতেন না। দুর্গাপূজা উপলক্ষে যাঁহার বস্ত্রদান দশ হাজার টাকার কম ছিল না, তিনি যে একটা সামান্য জিনিষ নষ্ট হইতে দেখিলে কষ্ট পাইতেন, ইহা অনেকে বুঝিতেই পারিতেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিয়ম ছিল, বৈকালে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে তাঁহাকে জলযোগ না করাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিতেন না। তাঁহার কলেজের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপককে কলেজের প্রতিদিনের অবস্থা জানিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রতিদিনই সংবাদ দিতে হইত। তদনুসারে তাঁহাকে প্রায় প্রতিদিনই বৈকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে যাইতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে জলযোগ না করাইয়া ছাড়িবার লোক নন, সুতরাং অসুখ না থাকিলে প্রায়ই তাঁহাকে জলযোগ

করিতে হইত। একদিন অধ্যাপক মহাশয়কে মিষ্টান্নের সহিত কমলালেবু খাইতে দেওয়া হয়। তিনি লেবু খাইয়া তাহার ছিবড়া জানালা দিয়া নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোবড়া ফেলিয়া দিতে দেখিয়া বলিলেন, "ওগো, ছোবড়া ফেলিয়া দিও না। এই স্থানে রাখ, পরে ইহার উপকারিতা দেখিতে পাইবে।" জলযোগও শেষ হইল, বিদ্যাসাগর মহাশয় কমলালেবুর ছিবড়াগুলি লইয়া ছাদে যাইলেন ও অতি সন্তর্পণে প্রকাশ্য স্থানে রাখিলেন। দেখিতে দেখিতে কাকের পাল আসিয়া সেই ছিবড়া খাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কাকদিগের আনন্দ দেখিয়া মহাহৃষ্ট হইলেন, অধ্যাপক অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যাঁহার বার্ষিক আয় ৭৫ হাজার টাকা, তিনি একটী ছোবড়া পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে দেন না বলিয়াই বোধ হয় ভগবান্ ইঁহার গৃহে অর্থ রাশি ঢালিয়া দিয়াছেন।

৩। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন বাল্যকালে একদিন কোনও আত্মীয়ভবনে যাইতেছিলেন। পথে পদব্রজে চলিয়া যাওয়াতে ক্ষুধার সঞ্চার হয়, সুতরাং ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য খাদ্যসামগ্রী কিনিতে উদ্যত হইলেন। দেখিলেন একটা বৃদ্ধা রমণী পথের ধারে বসিয়া আম্র বিক্রয় করিতেছে। তিনি বৃদ্ধার হস্তে একটী পয়সা দিয়া এক পয়সার আম্র চাহিলেন। সেবারে আম্র অজস্র জন্মিয়াছিল। বৃদ্ধা এক পয়সার আম্র গণিতে লাগিল, "এই এক গণ্ডা, দু গণ্ডা, তিন গণ্ডা," তর্করত্ন মহাশয় তাহার গণনায় ব্যাঘাত দিয়া বলিলেন, "বাছা, কত গণিতেছ?" বৃদ্ধা হস্তস্থিত আর একটী পয়সা দেখাইয়া বলিল, "আপনি বামনের ছেলে, আপনাকে কি কম দিব? এই দেখ এক পয়সার আম আগে বেচিয়াছি। তাহকে এক পয়সায় পঁচিশটা দিয়াছি, তোমাকেও তাহাই দিব। তর্করত্ন মহাশয় অবাক্ হইয়া সহাস্য বদনে বলিতে লাগিলেন, ওগো, "আমায় অত আম্র দিতে হইবেনা, আমাকে চারিটা

দিলেই যথেষ্ট হইবে।" বৃদ্ধা বলিল, "না বাপু, তুমি বামনের ছেলে, আমি তোমাকে পঁচিশটার একটাও কম দিতে পারিব না। ইচ্ছা হয় পঁচিশ আম লও, অন্যথা পয়সা ফিরাইয়া লও। তর্করত্ন মহাশয় অগত্যা পঁচিশটী আম্র লইতে বাধ্য হইলেন ও নিকটবর্ত্তী একটী জলাশয়ের বাঁধান ঘাটে গিয়া আম্র খাইতে বসিলেন। দুই চারিটী আম্র ভক্ষণান্তে তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল, সুতরাং এত আম্র লইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। বালকস্বভাব হেতু আম্র লইয়া পুষ্করিণীর জলে ছিনিমিনি খেলিবার জন্য একটী আম্র জলে সজোরে ফেলিলেন, কিন্তু এইরূপে দ্রব্য বৃথা নষ্ট করিতে শরীর সিহরিয়া উঠিল, আর নষ্ট করিতে পারিলেন না। শেষে "যাকে রাখ, সেই রাখে" এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া আম্রগুলি বাঁধিয়া রাখিলেন। কিন্তু গন্তব্য স্থান এখনও বহুদূরে, অত পথ কিরূপে বহিয়া লইয়া যাইব, ভাবিয়া অন্যমনা হইলেন।

অল্পক্ষণ পরে কয়েকটী কৃষক পথিক তথায় জলপান করিতে আসিল। তর্করত্ন মহাশয় তাহাদিগকে আম্র কয়েকটী খাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা তাঁহার অনুরোধ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া, সেই আম্র কয়েকটী ভক্ষণ করিল ও জলপান করিয়া প্রস্থান করিল। তর্করত্ন মহাশয় যখন দেখিলেন, যথেষ্ট বিশ্রাম লাভ হইয়াছে, তখন গন্তব্যস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছেন এমন সময়ে আকাশ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইল ও ভয়ঙ্কর ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পথিমধ্যে কোনও আশ্রয় মিলিল না, সুতরাং তর্করত্ন মহাশয় প্রাণের আশা ত্যাগ করিলেন।

এদিকে উক্ত কৃষকগণ ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, যে ব্রাহ্মণবালক আমাদিগকে আঁব খাওয়াইয়াছে, তাহার কি দশা হইয়াছে! অতএব আইস আমরা ফিরিয়া গিয়া সেই বামনের

ছেলেটীকে বাঁচাই। এই বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতে লাগিল, এবং শেষে মুহ্যমান বালককে পাইয়া কোলে করিয়া অতি দ্রুতপদে এক আশ্রয়ে লইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইল। তখন তর্করত্ন মহাশয় মনে মনে বলিতে লাগিলেন আমি যে আম্রগুলিকে ছিনিমিনি না খেলিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহারা আমার প্রাণ বাঁচাইবার হেতু হইল। "যাকে রাখ, সেই রাখে" এই যে মহাবাক্য প্রচলিত আছে, ইহার ন্যায় সত্য আর যে দেখিতেছি না!!

রন্ধন।

পুরাকালে ভারতবর্ষে রন্ধনকার্য্যের অতি প্রশংসা ছিল। নলরাজা, ভীমসেন ইঁহারা যেমন বীরত্বে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, সেইরূপ আবার রন্ধন কার্য্যেও খ্যাতি লাভ করেন। স্ত্রীলোকদিগের ত কথাই নাই; 'দ্রৌপদীর ন্যায় রাঁধুনী হও' এই আশীর্ব্বাদ আজিও প্রতি ললনার উপর বর্ষিত হয়। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ স্বপাকেই আহার করিতেন; তাঁহাদের সুরস প্রসাদ পাইবার জন্য বহু ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিও লালায়িত হইতেন। রন্ধনকার্য্য প্রত্যেক বালকেরও করণীয় বলিয়া পূর্ব্বে গৃহস্থগণ আপন আপন বালকদিগকে বনভোজন করিতে উৎসাহ দিতেন। বালকেরা দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া বনে গিয়া পাক করিত ও মহা আনন্দে আহার করিত।

এক বঙ্গীয় যুবক বিদেশে কর্ম্ম করিতেন। তিনি সেই কার্য্যে ধনবান্ হন। দেশেই যে কেবল প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা নহে কর্ম্মস্থলেও প্রাসাদ, দাস, দাসী, পাচক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ছিল। তিনি কর্ম্মস্থানেও বহু লোককে অন্নদান করিতেন।

একদা রাত্রিকালে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সস্ত্রীক নিদ্রিত হইয়াছেন

এমন সময় কয়েকটী আত্মীয় ব্যক্তি কার্য্যানুরোধে তাঁহার বাসাবাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাত্রি তখন ১২ টা। তাঁহার শয়ন করিতে ১১৷৹ হয়। অর্দ্ধ ঘটিকা নিদ্রান্তে তিনি শয্যা ত্যাগ করিলেন ও পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশন করাইলেন। "রাত্রিতে কি আহার করেন ?" জিজ্ঞাসান্তে তাঁহারা সকলেই বলিলেন, আমরা অন্নই আহার করিয়া থাকি, তবে অদ্য রাত্রি বারটা হইয়াছে, এক্ষণে দাস দাসী-দিগকে জাগাইয়া তাহাদিগকে ক্লেশ দিবার প্রয়োজন নাই। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেই চলিবে। ধনবান্ যুবক বলিলেন, "তাহা হইতেই পারে না, আপনাদিগকে অন্ন আহার করিতেই হইবে। আপনাদের অভিপ্রায়ানুসারে আমি দাস দাসীদিগের নিদ্রার ব্যাঘাত করিব না, আমার স্ত্রীই স্বয়ং রন্ধনাদি করিবেন।"

সমুপাগত আত্মীয়গণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি ? তিনি বড়মানুষের কন্যা ও বড় মানুষের বধু, তিনি এত রাত্রিতে কি এই কষ্ট করিতে পারিবেন ? আপনি তাঁহাকে জাগাইয়া কষ্টে ফেলিবেন না।"

যুবক বলিলেন, "মহাশয়গণ, যে কায়স্থ কলম দেখিয়া ডরায় সে কায়স্থের সন্তান নয়, আর যে স্ত্রীলোক, হাঁড়ি দেখিয়া ডরায়, সে ভদ্রলোকের কন্যা নয়। আপনারা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

যুবকের পত্নী স্বামীর এই বাক্য শুনিবামাত্র শয্যাত্যাগ করিলেন ও কোন দাসদাসী না ডাকিয়া নিজেই তিনটী চুল্লীতে অগ্নি দিয়া একটিতে অন্ন, আর একটিতে ডাউল, ও অন্য চুল্লীতে ভাজা, ও বিবিধ তরকারি প্রস্তুত করিয়া, একটা বাজিবার পনর মিনিট থাকিতেই, তাঁহাদিগকে আহারার্থ আহ্বান করিলেন, ও স্বয়ং পরিবেষণ করিয়া তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিলেন। তাঁহারা এই অদ্ভুত ব্যাপারে একেবারে চমৎকৃত হইয়া সস্ত্রীক যুবকের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

বিপদে সাহস

২৪ পরগণার এক ভদ্র ব্যক্তি আগ্রায় কর্ম্মোপলক্ষে কিছুকাল বাস করেন। অবস্থা ভাল থাকাতে একটী বাঙ্‌লো ভাড়া লন। বাঙ্‌লোর সম্মুখে একটী বাগান, বাগানটী অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য বাঙ্‌লো ইংরাজ-মহোদয়গণ দ্বারা অধ্যুষিত।

বঙ্গীয় ভদ্রলোকটীর একটী ভৃত্যের ক্রমশঃ ধারণা হইতে লাগিল, আত্মরক্ষার্থ ইংরাজদিগের যেরূপ পিস্তলাদি আছে ইঁহাদের তাহা নাই, সুতরাং এখানে দস্যুবৃত্তি করা সহজ। এই স্থির করিয়া একদিন এক দস্যুর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা দ্বারা মনিবের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে মানস করিল ও একদিন দ্বিপ্রহর নিশাকালে যখন সকলে নিদ্রিত, সেই সময়ে দস্যুকে মনিবের বাঙ্‌লো আক্রমণ করিতে উপদেশ দিল।

দস্যু ভৃত্যের উপদেশানুসারে অর্দ্ধরাত্রে বাঙ্‌লোর দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভয়ে স্তম্ভিত করিবার জন্য সার্সিতে মুষলাঘাত করিল। সার্সির কাচ চূর্ণ হইয়া নিদ্রিতদিগের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিল। সকলেই আত্মরক্ষার্থ নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল ও পরিত্রাণের জন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাঁহারা ভৃত্যকে কতই ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার কোনও উত্তর নাই। গৃহস্বামী দস্যুর ভয়ে বিহ্বল না হইয়া তাহাকে আক্রমণার্থ একটী প্রকাণ্ড লগুড় সংগ্রহ করিলেন।

দস্যু গৃহে শায়িতদিগকে ভয়ে বিহ্বল মনে করিয়া, দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে যেমন প্রবেশ করিল অমনি গৃহস্বামী তাহাকে লগুড় দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। কিন্তু দস্যু তূলাদি দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া প্রস্তুত হইয়া আসাতে লাঠিতে তাহার কিছুই হইল না, কেবল

ধপ্ করিয়া একটা শব্দমাত্র' হইল। এবারে দস্যু সজোরে গৃহস্বামীর মস্তকে লগুড়াঘাত করিল। এই লগুড় মস্তককে এমন আহত করিল যে আহত স্থান ফাটিয়া গেল ও শোণিত বহিতে লাগিল গৃহস্বামী দস্যুকে লগুড়াঘাত করা বৃথা ভাবিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই সুবিধায় দস্যু গৃহস্বামীর আহত স্থানে আর একবার লগুড়াঘাত করিবার জন্য লগুড় উত্তোলন করিল। দ্বিতীয় প্রহারে গৃহস্বামীর প্রাণ নষ্ট হইতে বসিয়াছে দেখিয়া তাঁহার পত্নী আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া সেই লগুড়াঘাত নিজের মস্তকে গ্রহণ করিবার আশয়ে দস্যু ও স্বামী উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন ও নিজ মস্তকে লগুড়াঘাতের অপেক্ষা করিতে লাগি- লেন। কিন্তু, চামুণ্ডার দর্শনে অসুর যেরূপ্ ত্রস্ত হইয়া পড়ে, দস্যু সেইরূপ সংস্কারবশতঃ স্ত্রীলোকদর্শনে জড়সড় হইয়া লগুড়াঘাত সংবরণ করিল ও ভয়ে পলায়ন করিল। তখন পতিপরায়ণা রমণী পতিরও প্রাণ রক্ষা হইল, নিজেও প্রাণ হারাইলেন না দেখিয়া জগন্মাতার উদ্দেশে ভক্তিবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। নিকটস্থ বাঙ্লোবাসী ইংরাজগণ গৃহস্বামীর বিপদুদ্ধারের জন্য পিস্তলহস্তে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে ভৃত্যটীও এক প্রকাণ্ড লগুড় হস্তে আসিয়া দাঁড়াইল। "হাঁরে, এত চীৎকারে তোর ঘুম ভাঙ্গে নাই" বলাতে সে বলিতে লাগিল "আমি ঘুমের ঘোরে উঠিয়া লাঠি খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, সেই জন্য আসিতে বিলম্ব হইল।" পত্নী সাহস অবলম্বন করিয়া নিজ প্রাণ উৎসর্গ করাতে স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়াছে, জানিয়া ইংবাজগণ তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন ও গৃহস্বামীর ভবিষ্যতে এরূপ বিপদ্ না হয় সেই উদ্দেশ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এক উৎকৃষ্ট পিস্তল সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

মনিবের বিপদে বিপদ্‌জ্ঞান।

এক সময়ে (জেনেরেল এসেম্ব্লি) স্কটিস্‌ চর্চ্চ কলেজের বড়ই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। কলেজ কখন্‌ উঠে কখন্‌ উঠে এই ভাব হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে কলিকাতায় পটলডাঙ্গায় সিটিকলেজের সূত্রপাত হয়। সিটিকলেজের কার্য্য দেশীয় অধ্যাপকগণ দ্বারা সম্পাদিত হইবার বাসনায় তৎকালে যাঁহারা প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিবার বাসনা হয়। বাবু আনন্দ মোহন বসু যদিও ব্যারিষ্টারের কাজ করিতেন তথাপি সময় করিয়া সিটিকলেজে গণিত অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সংস্কৃত পড়াইবার আংশিক ভার লইলেন। এইরূপ সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্‌দিগের সাহায্যে সিটিকলেজকে আদর্শ বিদ্যালয় করিবার অভিলাষে বাবু গৌরীশঙ্করকে তথায় আনাইয়া গণিতের ভার অর্পণ করিতে সকলেরই প্রবল ইচ্ছা হইল। স্কটিস্‌চর্চ্চ বিদ্যালয়ের যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে গৌরীশঙ্করকে যে সহজে সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে তাহাতে সকলেরই বিশ্বাস হইল। তদনুসারে বাবু আনন্দমোহন বসু উমেশচন্দ্র দত্তকে গৌরীশঙ্করের নিকট পাঠাইলেন।

বাবু উমেশচন্দ্র গৌরীশঙ্করকে অগ্রে কিছু না বলিয়া তাঁহাকে সিটিকলেজে আনন্দ মোহনের নিকট উপস্থিত করিলেন। বাবু আনন্দ মোহন বসু গৌরীশঙ্করকে বলিতে লাগিলেন, "মহাশয় আমরা যে উদ্দেশ্যে সিটিকলেজ স্থাপিত করিয়াছি তাহা আপনার অবিদিত নাই। দেশীয় অধ্যাপক ব্যতীত ইউরোপীয় অধ্যাপক দ্বারা ইহার কার্য্য চালান হইবে না এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া আপনার ন্যায় কৃতবিদ্য অধ্যাপকের সংগ্রহে আমরা কৃতসংকল্প হইয়াছি। স্কটিস্‌চর্চ্চ কলেজে আপনার অধ্যাপনা চাকরী কবে আছে, কবে নাই এই ভাব দাঁড়াইয়াছে। আপনারও চাকরী না

থাকিলে বিশেষ কষ্ট হইবে। অতএব আপনি এই সুযোগে সিটি কলেজে আসিয়া যোগ দিন। এখানে আপনার অর্থাগমের বিশেষ সুবিধাই হইবে।

বাবু গৌরীশঙ্কর দে আনন্দ মোহন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিতে লাগিলেন "মহাশয়, এখন স্কটিস্‌চর্চ্চ বিদ্যালয়ের যে দুরবস্থা তাহাতে ইহা উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা বটে, সিটিকলেজে আসিলে আমার বিশেষ সুবিধাও হইবে বটে, কিন্তু অসময়ে সে বিদ্যালয় কি করিয়া ছাড়িয়া আসিব? যদি স্কটিস্‌চর্চ্চ বিদ্যালয়ের সময় ভাল হইত, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া আপনার এখানে আসিতে পারিতাম। তাঁহারাও আমার এখানে ভাল হইতেছে বুঝিয়া অনায়াসেই ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের বিপদ্‌ দেখিতেছি, তখন একথা তাঁহাদের কাণে কি করিয়া তুলিব? সুতরাং যতদিন তাঁহারা না বলিতেছেন 'তোমরা অন্যত্র চেষ্টা দেখ, এখানে আর আমরা তোমাদিগকে রাখিতে পারিতেছি না' ততদিন আমি তাঁহাদিগকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। ইহাতে যদি অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও তাঁহাদের আশ্রয়ে পড়িয়া থাকিতে হয়, তাহাও করিব।

বাবু আনন্দ মোহন বসু গৌরীশঙ্কর বাবুকে তাঁহার প্রস্তাবের অন্যথাচরণ করিতে শুনিয়া দুঃখিত হইবেন কি, গৌরীশঙ্করের প্রতি তাঁহার এমন একটা শ্রদ্ধা হইল যে তিনি হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, গৌরশঙ্কর বাবু, আপনার এই বাক্যে আপনাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আপনার এই বাক্য আপনার অন্তরস্থ অসামান্য মহত্ত্বই বিকাশ করিতেছে। আপনাকে না পাইয়া সিটিকলেজ ক্ষতিবোধ করিবে বটে কিন্তু বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হইল।"

পরিমিত ব্যয়।

কলিকাতা বঙ্গবাসিকলেজের অধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী গিরিশ চন্দ্র বসুর অধ্যয়ন কালে তাঁহার বন্ধু মহেন্দ্রনাথ সেন নামে একটী বালক অতি দরিদ্র ছিল। কিন্তু অতিশয় মেধাবী হওয়াতে দারিদ্র্যদুঃখে নিপীড়িত হইয়াও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া চারি টাকা বৃত্তি পায় ও তাহার সাহায্যে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়। যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ও তৎপরে এল, এ পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধ্যে পরিগণিত হওয়াতে সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি লাভ করে ও তাহার সাহায্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবিষ্ট হয়। তথায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া একশত মুদ্রা বৃত্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। দরিদ্র পরিবারে মাসিক আয় এক শত টাকা হওয়াতে সংসার সচ্ছলে চলিতে লাগিল ও সমস্ত দারিদ্র্য দুঃখ নিবারিত হইল। এক ধনবান্ ব্যক্তি মহেন্দ্র নাথকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মহেন্দ্রনাথ পাঠ সমাপনান্তে স্বর্ণ-পদক পুরস্কার পাইলেন ও দুই শত পঞ্চাশ টাকা বেতনের এক চাকরী পাইলেন তখনকার ২৫০ টাকা এক্ষণকার হাজার টাকা। দুর্ভাগ্যক্রমে যেদিন চাকরীর পত্র পাইলেন তাহার দুই তিন দিন পরেই তিনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া বন্ধু, বান্ধব, নববধূ ও এক বিধবা অনাথা ভগিনীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক যাত্রা করিলেন। এক্ষণে মহেন্দ্রনাথের পরিবারে দারিদ্র্যের নিপীড়ন পূর্ব্ববৎ আরম্ভ হইল। নববধূ চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে পিতৃকুলে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু বিধবা অনাথা ভগিনী চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন।

এক বেলা একমুষ্টি অন্ন দেয়, এমন কাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

দিবারাত্রি তাঁহার চক্ষে বারিধারা বহিতে লাগিল। বাবু গিরিশচন্দ্র তাঁহার বন্ধুর মৃত্যুসংবাদে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন, বিশেষতঃ মহেন্দ্রনাথের বিধবা ভগিনীর কি দশা হইয়াছে ভাবিয়া অস্থির হইলেন। তিনি সত্বর মহেন্দ্রনাথের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভগিনীকে অনেক বুঝাইলেন ও শেষে বলিলেন, ভগিনি, তোমার ভরণ পোষণের ভার আমি লইলাম। মনে কর আমিই তোমার মহেন্দ্র। আমি যতদিন বাঁচিব তোমাকে প্রতি মাসে পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিব। আমি যেখানেই থাকি, তোমার ঠিকানায় পাঁচটী করিয়া টাকা যথাসময়ে আসিবে।

মহেন্দ্রের বিধবা ভগিনী আশ্রয় পাইয়া মনে মনে তাঁহার মঙ্গলের জন্য বিধাতার নিকট অশ্রুপাত করিলেন, তাঁহার অন্নের ভাবনা ঘুচিয়া গেল।

ছয় বৎসর প্রতি মাসে বাবু গিরিশচন্দ্র নিয়মিত টাকা পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু মহেন্দ্রনাথের ভগিনী তাহা হইতে প্রতি মাসে দুইটী করিয়া টাকা নিজের অন্নবস্ত্রে ব্যয় করিয়া বাকী তিন টাকা নিকটবর্ত্তী সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমাইয়া রাখিতে লাগিলেন। ছয় বৎসর পরে তাঁহার সাংঘাতিক রোগ দেখা দিল, তিনি মৃত্যুর দিন গিরিশ চন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন, "গিরিশ দাদা, তোমার সমস্ত টাকা আমার ব্যয় করিতে হয় নাই। দুই টাকাতেই আমার সমস্ত খরচ কুলাইয়াছে। প্রতি মাসে বাকি তিন টাকা করিয়া, জমাইয়া রাখিয়াছি। ছয় বৎসরে তিন টাকা করিয়া যাহা জমিয়াছে তাহা তুমি লইও, এক্ষণে চিরদিনের জন্য বিদায় লইলাম। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন।"

বাবু গিরিশচন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। মহেন্দ্র-নাথের ভগিনীর স্বল্পব্যয়িতা চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন এরূপ রমণী নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর ঘরের আদর্শ রত্ন। তিনি সেই

সঞ্চিত মুদ্রা নিজে গ্রহণ না করিয়া তাঁহার আত্মীয়দিগকে বলিলেন, “এই সঞ্চিত মুদ্রা আমার নয়, ইহা মহেন্দ্রনাথের ভগিনীর স্বোপার্জ্জিত ধন, সুতরাং তাঁহারই শ্রাদ্ধে ব্যয়িত কর।” এই বাক্যে রমণীর আত্মীয়গণ উক্ত সঞ্চিত অর্থে মহা উৎসাহে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া সংসারে তাঁহার গৌরব প্রচার করিলেন।

স্নেহহীনের প্রতি ঘৃণা।

পূর্ব্ববঙ্গে এক গণ্ডগ্রামে এক গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহারা দুই সহোদর। কনিষ্ঠ সর্ব্বদাই জ্যেষ্ঠের অনুগত ছিলেন। কর্ম্মকাজ করিয়া যাহাই উপার্জ্জন করিতেন সমস্তই দাদার হাতে দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের প্রতি এমন স্নেহপরায়ণ ছিলেন যে, জ্যেষ্ঠের পত্নী তজ্জন্য সময়ে সময়ে অসূয়াপরবশ হইতেন। কিন্তু কনিষ্ঠের উপার্জ্জনে সংসারে সচ্ছল অবস্থা হওয়াতে তিনি অসূয়াবৃত্তি প্রকাশ করিবার অবসর পাইতেন না। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের বিবাহ দিলেন ও ক্রমে তাঁহার দুইটী সন্তানের মুখ দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি নিজের সন্তানগুলিকে যেমন যত্ন করিতেন, ভ্রাতার সন্তানগুলিকে ঠিক সেই ভাবে যত্ন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠের পুত্রদিগের কোনও অসুখ হইলে তাহারা মাতাকে না জানাইয়া জ্যেষ্ঠ তাতকেই জানাইত। তাহাদের যাহা কিছু আবদার, সমস্তই জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের নিকটেই হইত। জেঠাইমার বিষনয়নে পড়িয়াও জেঠামহাশয়ের জন্য কখনও কোনও কষ্ট পাইতে হইত না।

কনিষ্ঠ কর্ম্মকাজ উপলক্ষে অনেক সময়ে বিদেশে পড়িয়া থাকিতেন। একদিন সংবাদ আসিল, তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ এই সংবাদে কাতর হইয়া অবিলম্বে কনিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন ও

তাঁহার আরোগ্যের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া পরম শান্তিতে কলেবর ত্যাগ করিলেন; স্ত্রীপুত্রদের জন্য প্রাণ কাঁদিল বটে কিন্তু তাহাদের জন্য ভাবনা হইল না, কারণ তাঁহার ধারণা ছিল, দাদা যতদিন জীবিত থাকিবেন, তাহাদের কোনও কষ্ট হইবে না।

জ্যেষ্ঠ প্রাণসম কনিষ্ঠের বিয়োগে অতিশয় আকুল হইলেন, এবং বাটীতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অনেক শোক তাপ করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠের পত্নী পিতৃহীন দুইটী নাবালক লইয়া ভাশুরের চরণ প্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ছেলে দুইটী বাবা গো, বাবা গো করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

এরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্যে জেঠাইমার চক্ষে জল নাই। তিনি আর এক গৃহে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। স্বামীর ভালবাসার ভাগ যে লইয়াছিল সেই কণ্টক আজ বিদূরিত হওয়াতে তাঁহার মনে যেন কতকটা শান্তি ভাবের আবির্ভাব হইল। মুখে যদিও হাস্য বিকাশ পায় নাই, অন্তরে কিন্তু হাস্য বিরাজ করিতেছিল।

সময়ে সকলই সহ্য হয়। জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃবিয়োগ-শোক কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু ভ্রাতৃবধূর স্বামিবিয়োগশোক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাকে নিরন্তর অশ্রুমুখী দেখিতে পাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। "শোকের প্রকৃতি, উহা সময়ে কমিয়া যায়, কিন্তু আমার কনিষ্ঠের পত্নীর অশ্রুপ্রবাহ কমিতেছে না কেন?" শেষে দেখিতে পাইলেন, ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতৃপুত্রদ্বয় গৃহকর্ত্রীর নিকট সর্ব্বদাই লাঞ্ছিত হইতেছে! বালকদ্বয় জেঠাইমার বিষনয়নে পড়িয়া সর্ব্বদাই সন্তপ্ত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে ও মায়ের অশ্রুধারা বাড়াইতেছে।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা একদিন স্বয়ং ভ্রাতৃপুত্র ও ভ্রাতৃপত্নীর উপর পত্নীর ভয়ঙ্কর

কর্কশ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি গোপনে স্ত্রীকে অনেক বুঝাইলেন, "দেবর সন্তানসদৃশ, তাহার পত্নী তোমার পুত্রবধূসদৃশ ও তাহার পুত্রদ্বয় তোমার নপ্তৃসদৃশ; উহাদের প্রতি সাধু ব্যবহার করিলে দেবগণ তুষ্ট হন ও সংসারের মঙ্গল বিধান করেন" ইত্যাদি অনেক বলিলেন কিন্তু তাঁহার সমস্ত উপদেশ ভাসিয়া গেল। শেষে স্বামী ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, দেখ গৃহিণি, তুমি যদি উহাদিগকে লইয়া সংসার করিতে না চাহ, আমি উহাদিগকে লইয়া ভিন্ন হইব।

এই বাক্যে পত্নীর মনে ভীতির সঞ্চার হওয়া দূরে থাকুক, তিনি মুখরা হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আমি উহাদিগকে লইয়া সংসার করিতে পারিব না। আমার সন্তান যখন কার্য্যক্ষম হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে তখন আমি তোমার চোকরাঙানির ভয় করি না। তুমি উহাদিগকে লইয়া সুখে থাক, আমি আমার পুত্রবধূ ও পৌত্র লইয়া পৃথক্ হইয়া থাকিব।"

স্বামী পত্নীর এই বিরূপ প্রবৃত্তি দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন। তিনি কিছু দিন পত্নীর মন তুষ্ট করিয়া ভ্রাতৃবধূর প্রতি অনুকূলতা জন্মাইবার বিস্তর চেষ্টা করিলেন কিন্তু বুঝিলেন তাঁহার চিত্ততোষ সম্পাদন করা একেবারেই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

একদিন স্বামী পত্নীকে বলিলেন "দেখ গৃহিণি, তোমার সহিত আমার বহুদিনের প্রণয়, তোমাকে ছাড়িতে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। শাস্ত্রে আছে পত্নী স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইবেন, কিন্তু তুমি কিছুতেই হইলে না। স্নেহের দায়ে পড়িয়া আমি এতদিনের প্রণয়ের রজ্জু ছিন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। অতএব তুমি তোমার পুত্র, পুত্রবধূ ও নপ্তা লইয়া পৃথক্ হইতে যদি ইচ্ছা কর, তবে পৃথক্ হও। আমি স্নেহের দায় এড়াইতে পারিব না।"

পত্নী এই বাক্যে স্বামীকে কর্কশভাবে বলিয়া ফেলিলেন, "বেশ এক্ষণেই পৃথক্ করিয়া দেও। কিন্তু আমার পুত্রের উপার্জ্জনের এক পয়সাও উহাদিগকে দিতে পারিবে না।" পত্নী এই কথা বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার স্বামীর মন যেরূপ কোমল, তাহাতে তাঁহাকে আমার সংসারে আনিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। উহারা পৃথক্ হইলে শেষে স্বামীকে নিজ সংসারে আনিয়া ফেলিব।" কিন্তু পত্নীর এ আশা দুরাশা হইল। স্বামী স্নেহের দায়কে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দায় মনে করিয়া পত্নীর সংসার হইতে পৃথক্ হইলেন ও স্ত্রীর মুখ আর সহজে দেখিতে হইবে না ভাবিয়া, বসতবাটী প্রাচীর দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিলেন। পৃথক্ বহির্দ্বার হইল। পরস্পরের মুখদর্শন রহিত হইল। পত্নী স্বামিদর্শনার্থ এক এক দিন এবাটীতে আসেন কিন্তু স্বামী আর দর্শন দেন না। একদিন পত্নী পৌত্র কোলে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৌত্র পিতামহকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দাদামণি, আমি এসেছি।" পিতামহ চক্ষু বুজাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদু, 'কার কোলে উঠিয়া আসিয়াছ? পৌত্র বলিল "আমি ঠাকুরমার কোলে উঠিয়া আসিয়াছি।" গৃহস্থ এই বাক্যে আর চক্ষু খুলিলেন না, চক্ষু বুজাইয়াই বসিয়া রহিলেন। পত্নী ভাবিয়াছিলেন আজ স্বামীর দর্শন নিশ্চয়ই পাইব, কিন্তু এক্ষণে বুঝিলেন, স্নেহের দায়ের মত দায় সংসারে আর নাই। ইহা সমস্ত বন্ধন অবলীলাক্রমে ছিন্ন করিয়া ফেলে। স্বামী আর যে কখন তাঁহার মুখ দেখিবেন তাহার তিলমাত্রও আশা না থাকাতে, তিনি অশ্রুমুখী হইলেন। তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি স্বামিধনে যে একেবারেই বঞ্চিত হইয়াছেন ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। শেষে মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হায়! আমি কি করিলাম! স্বামীর স্নেহের বস্তুকে পর করিতে গিয়া চিরদিনের জন্য পর হইয়া গেলাম!!"

"আমি যদি অগ্রে জানিতাম মায়ের পেটের ভাইয়ের উপরে যে টান

এমন টান আর দ্বিতীয় নাই, তাহা হইলে কি আমি এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিতাম! এখন আমার জীবন শ্মশান হইল। আমার জীবনে ধিক্, স্বামী জীবিত থাকিতে আমাকে স্বামিহীন হইয়া এই সংসারে থাকিতে হইবে!!! স্ত্রীলোকের প্রধান দেবতা স্বামী। আমি সেই দেবতার আর দর্শন পাইব না! নারকী প্রাণ, তুই আর সংসারে থাকিয়া এ সংসারকে কলুষিত করিস না। নারী বিধবা হইলে, সধবা রমণীগণ তাহার মুখদর্শন কেবল একদিন মাত্র করে না, কিন্তু আমার মুখদর্শন যে কখনই করিবে না!

সন্তানের প্রতি চির আদর।

ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র 'নেশনের' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক নগেন্দ্র নাথ ঘোষ (এন্, ঘোষ) বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। বক্তৃতাশক্তি বিশেষ থাকিলেও তিনি শিক্ষা বিভাগে থাকিয়া জীবনাতিপাত করিতে ইচ্ছা করেন ও তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটান্ কলেজে শিক্ষাদানার্থ নিযুক্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন, তিনিও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পিতৃবৎ দেখিতেন ও তাঁহার পত্নীকে মাতৃবৎ ভক্তি করিতেন। ক্রমে এতই আনুগত্য হইতে লাগিল যে, তাঁহারা যেন একপরিবার ভুক্ত হইয়া পড়িলেন। নগেন্দ্রনাথের পত্নী কোন কার্য্যোপলক্ষে যেরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে আসিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ত্রীও সেইরূপ নগেন্দ্রনাথের বাটীতে যাইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

একদিন কোনও কার্য্যোপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী নগেন্দ্র নাথের বাটীতে গমন করেন ও সমস্ত দিন নগেন্দ্রনাথের মা ও স্ত্রী পুত্র-দিগের সহিত আনন্দে দিনাতিপাত করেন।

অপরাহ্নে নগেন্দ্রনাথ পাঠনা-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া মেট্রপলিটান কলেজ হইতে নিজ ভবনে উপস্থিত হইলেন ও পরিচ্ছদাদি উন্মোচন করিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিবার জন্য জল চাহিলেন। নগেন্দ্র নাথের মাতা ও পত্নী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত থাকাতে তাঁহারা দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, ঝি, জল আনিয়া দে। দাসী অন্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে নগেন্দ্রনাথের জল মিলিল না। নগেন্দ্র নাথ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু জল আসিল না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্নী আর থাকিতে পারিলেন না, গাত্রোত্থান করিলেন ও গাড়ুতে জল লইয়া নগেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, বাবা, হাত পাত, আমি তোমার হাতে জল ঢালিয়া দিতেছি। নগেন্দ্রনাথ একেবারে জড়সড় হইয়া, "একি মা, আপনিই জল আনিয়াছেন? দাসী এক্ষণেই আনিবে, আপনি ব্যস্ত হইবেন না। কি সর্ব্বনাশ! আপনার জলে আমি হাত মুখ ধুইব! আপনি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি দাসানুদাস, আপনার জলে আমি মুখ হাত ধুইব! এযে আমার পক্ষে বড়ই আস্পর্দ্ধার কাজ!!

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্নী ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন, "বৎস, সন্তানের সমস্ত কাজ জননীই ত করিবেন। তুমি যখন আমাকে মায়ের মত দেখ, তখন তোমার ফরমাস খাটা আমার একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনীয় হইয়াছে। অতএব তুমি দ্বিধা করিও না, হাত পাতিয়া ধর, আমি জল ঢালিয়া দিয়া মায়ের কার্য্য করি।"

নগেন্দ্রনাথ, তাঁহার মাতা ও পত্নী সকলেই অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কাহারই মুখে বাক্য সরিল না। কেবল মনে হইতে লাগিল, এবংবিধ রমণীরত্ন সহধর্ম্মিণী না হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বোধ হয় জগদ্বিখ্যাত হইতে পারিতেন না।

পরবিপদে আত্মহারা।

এক দিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ দুইটী শিশু সন্তান সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় হ্যারিসন রোড দিয়া যাইতেছিলেন। শিশুদ্বয় বাল্যসহজ চাঞ্চল্য বশতঃ পিতার অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া যাইয়া তাঁহা হইতে কিছু দূরে অবস্থান করিতেছিল। বিদ্যালয় বন্ধ হইলে যেমন সকল শিশুই মাতৃদর্শনার্থ ব্যগ্র হইয়া দ্রুতপদে চলে, বিদ্যাভূষণের শিশুদ্বয় সেইরূপ দ্রুত পদে চলিতেছিল এবং পরস্পর বলিতেছিল, আজ আমরা আমাদের শ্রেণীতে যে সুন্দর পড়া বলিতে পারিয়াছি, তাহা মা জানিতে পারিলে কতই আদর করিবেন, আমাদিগকে কোলে তুলিয়া কতই মুখচুম্বন করিবেন।" এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে শিশুদ্বয় যখন হেলিয়া দুলিয়া দ্রুতপদে যাইতেছিল, এবং পিতার পার্শ্ব হইতে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ পদ অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল, তখন একটা গলির ভিতর হইতে একটী যুড়ি গাড়ি বেগে শিশুদ্বয়ের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। একটী শিশু পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল। কিন্তু দ্বিতীয়টী পাশ কাটাইবার সময় না পাইয়া গাড়ির সম্মুখেই পতিত হইল। চারি দিকে পথিকগণের মধ্যে "হাঁ, হাঁ, রক্ষো রক্ষো, রক্ষো" শব্দ পড়িয়া গেল; শকটনায়ক প্রাণপণে ঘোটকের রশ্মি টানিয়া রহিল। ছেলেটী গাড়ি চাপা পড়িয়া পিশিয়া যাইবার উপক্রম হইল। পিতা, বালকের দিকে চাহিয়া ভাবিলেন, আমার প্রাণসম পুত্রটীত গাড়ির চাকায় ও ঘোটকের পদে পিশিয়া যাইতে বসিল, এ ভয়ঙ্কর হৃদয়বিদারক দৃশ্য কিরূপে স্বচক্ষে দেখি! চক্ষু আর সে দৃশ্যের দিকে তাকাইতে পারিল না, বুজিয়া গেল. কিন্তু যতই ভয়ঙ্কর দৃশ্যই হউক না, পুত্রের কি দশা হইল, না দেখিয়া

পিতা কতক্ষণ থাকিবেন? "ছেলেটী গেল গেল গেল গেল" এই রব-সমষ্টির অব্যবহিত পরেই "বাঃ, ধন্য তোমার জীবন," তোমা হতেই ছেলেটী আজ জীবন পাইল" এই অমৃতময় রব শুনিয়া পিতা যেমন নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিবেন অমনি দেখিতে পাইলেন, একটী পোষ্ট পিয়ন নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ঘোড়ার পায়ের মধ্য হইতে ছেলেটীকে বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। একটীকে রক্ষা করিতে গিয়া আর একটী মহাপুরুষ প্রাণ দিতেছে দেখিয়া, পথের সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ক্ষণেক নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে উভয়কেই নিরাপদ্ দেখিয়া তাহাদের মুখে আনন্দ ধ্বনি হইতে লাগিল। বিদ্যাভূষণ পুত্রকে ও পুত্ররক্ষককে অক্ষত দেখিয়া পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন ও ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শেষে শিশুর জীবন-রক্ষকের নিকট উপস্থিত হইয়া, কহিলেন, সাধো, তুমি পরের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া আত্মহারা হইয়া যে বিপন্ন হও নাই, ইহার জন্য আমি অগ্রে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তুমি যে জাতীয়ই হও, আজ ব্রাহ্মণের পূজ্য হইলে। তোমার ঋণ এ জীবনে যে শুধিতে পারিব, তাহার আশা নাই।

বালকের আত্মনির্ভরতায় বীরত্ব।

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ রায় ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র কলিকাতায় হেয়ারস্কুলে পাঠ করিত। যখন তাহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর তখন একদিন পিতা বুঝিলেন বিদ্যালয়ে পুত্রের অসৎসংসর্গ ঘুটিয়াছে। পুত্রের নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পিতা পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন; পুত্র তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে সংকল্প করিল, "আমি এমন বড় লোকদের সংসর্গে থাকিব যে পিতা একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইবেন।"

এই সময়ে জাপানদেশীয় কয়েকটী ভদ্রলোক উহাদের বাটীর নিকটে বাস করিতেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহাদের নিকট জাপানী ভাষা শিখিতে লাগিল। জাপানী ভাষা কিঞ্চিৎ আয়ত্ত হইলে, নিজ ভাগিনেয়ের নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া একেবারে জাপান দেশে গিয়া উপস্থিত। জাপান হইতে পিতাকে পত্র লিখিয়া জানাইল, "আপনারা আমার জন্য ভাবিবেন না, আমি আশ্রয়হীন হই নাই। ভদ্রলোকের সংসর্গে থাকিয়া যাহাতে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারি তাহার চেষ্টায় আছি।"

পিতা কিছুদিন পরেই জানিতে পারিলেন পুত্র আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। যাহার মাতৃ ক্রোড় ভিন্ন অন্য স্থানে সুখে নিদ্রা হইত না, সেই অল্পবয়স্ক বালক কিরূপে নির্ভয়চিত্তে পিতৃমাতৃবর্জ্জিত বিদেশে ক্রমাগত পাঁচ বৎসর কাল অনায়াসে বাস করিতেছে, এবং পিতার নিকট হইতে কোনও অর্থ সাহায্য না লইয়া নিজের সমস্ত খরচ চালাইতেছে, চিন্তা করিয়া সকলেই অবাক্ হইতে লাগিলেন।

সিটিকলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বনাথ মৈত্র মধ্যে আমেরিকায় গমন করেন। তাঁহার সহিত জ্ঞানেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ হেরম্বনাথের যেরূপ অতিথিসৎকার করে তাহা হেরম্বনাথের নিকট শুনিতে বড়ই আনন্দ হয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তারহীন টেলিগ্রাফের কাজ শিখিয়া কিছু টাকা উপার্জ্জন করিয়া সেই টাকার সাহায্যে ইউরোপের সমস্তদেশ পরিভ্রমণ করিয়া শেষে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়। পিতা একবার পুত্রকে পত্র লিখিয়া জানান, "বৎস, যখন আমেরিকায় উপস্থিত হইয়াছ, তখন এমন কিছু শিক্ষা করিয়া আইস যাহাতে অর্থাগম হয়।"

পুত্র পিতার পত্রে উত্তর দিল, "বাবা, আমি টাকা অপেক্ষা জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বস্তু মনে করি, কারণ টাকা নশ্বর কিন্তু জ্ঞান অবিনশ্বর। টাকায় আত্মার অধোগতি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু জ্ঞান আত্মাকে স্বর্গীয় করিতে পারে। সেই জন্য আমি জ্ঞান লাভের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমার জ্ঞান পিপাসায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে পুত্রবৎ যত্ন করিতেছেন। তিনি যেরূপ আমার পাঠের সহায়তা করিতেছেন, তাহাতে আমি শীঘ্রই যে গ্রাজুয়েট্ হইতে পারিব, সে আশা হইতেছে।" বালকের বয়ঃক্রম তখন অষ্টাদশ বর্ষ। বুদ্ধির প্রাখর্য্যে ও স্বাবলম্বনতায় এত অল্প কালে গ্রাজুয়েট্ হওয়া বিচিত্র নহে। বঙ্গের এই অদ্ভুত রত্ন যে আমাদের গৌরবের বস্তু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ফকীরের ভিক্ষাদান।

একদিন কলিকাতা অপার সার্কুলার রোডে এক অন্ধ ফকীর ভিক্ষা করিতেছে দৃষ্ট হইল। কোনও হৃদয়বান্ মহোদয় তাহার হাতে একটী পয়সা দিয়া তাহার সহিত ক্ষণেক বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। একজন সামান্ত অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুকের সহিত শিষ্টালাপ করিতে দেখিয়া তৎসম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য স্বভাবতঃই কৌতূহল জন্মে। সুতরাং এই ফকীরটী কে? ইহার সহিত শিষ্টালাপ করিবার কারণ কি? ইত্যাদি জিজ্ঞাসান্তে সেই ভদ্রমহোদয় বলিতে লাগিলেন, "এই অন্ধ অনাথ ফকীরটী সামান্য ব্যক্তি নহেন। আপনি ক্ষণকাল ইহার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিলে দেখিতে পাইবেন, ইনি সমস্ত দিন যাহা ভিক্ষা করিয়া উপার্জ্জন করেন তাহা নিরন্নদিগকে দান করিয়া নিঃশেষ করেন। দেখুন ইনি যে স্থানে বসিয়া ভিক্ষা করিতেছেন সেই স্থানটী একটী রুটীওয়ালার দোকানের নিকট। দোকানে যে সকল নিরন্ন ব্যক্তি রুটীওয়ালার নিকট রুটীর জন্য ভিক্ষা করিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে উন্মুখ হয়, ইনি তাহাদিগকে ডাকিয়া নিজের ভিক্ষালব্ধ পয়সা দিয়া তাহাদিগকে রুটী কিনিয়া দেন; সময়ে সময়ে এমনও ঘটে নিজে যাহা ভিক্ষা করিয়া পাইলেন তাহা সমস্তই উপোষিত ব্যক্তিদিগকে রুটী কিনিয়া দিতে ব্যয় করিয়া ফেলিলেন; এবং স্বয়ং উপবাসী থাকিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই দৃশ্যটী বড়ই মধুর। সে সময়ে ইহাঁর মুখের নির্ম্মল হাস্য দেখিলে প্রাণে কি এক পুণ্যময় ভাবের আবির্ভাব হয়! সকল সময়েই ভগবানের নাম ছাড়া ইহাঁর মুখে অন্য কথা শুনিতে পাইবেন না।"

ভদ্র মহোদয়ের মুখে এই বাক্য শুনিয়া ফকীরের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিয়া দেখা গেল তাঁহার ক্ষীণ দেহে পরিশুষ্ক বদনে কেমন এক প্রশান্ত ভাব রহিয়াছে। নিজে যে এত কষ্টে অবস্থান করিতেছেন, তাহা তাঁহার বদনে আদৌ লক্ষিত হইতেছে না। তাঁহার কর্ণ দাতাদিগের পদশব্দে আসক্ত নাই, কেবল রুটীর দোকানে অভুক্তদিগের ক্রন্দনের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। ইনি যতক্ষণ ক্ষুধাতুরের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সমর্থ না হন, ততক্ষণই অতি কষ্টের অবস্থায় থাকেন, নিজের বুভুক্ষাপীড়িত দেহের জন্য একবারও কাতর হইতে দেখা গেল না।

পাঠে অনুরাগ ও তাহার ফল।

১। আনন্দমোহন বসু (এ, এম্, বসু) মহোদয় ময়মনসিংহ বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই কলেজ হইতে যত পরীক্ষা দেন, সকল পরীক্ষাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। বি, এ, পরীক্ষায় অঙ্কের পরীক্ষক বলিয়াছিলেন, "আনন্দমোহনের উত্তর-প্রণালী অদ্বিতীয়; বিলাতের র‍্যাঙ্‌লার্ পর্য্যন্ত এমন ভাবে উত্তর লিখিতে পারেন না।"

অনন্দমোহনের পাঠগৃহে সমস্ত রাত্রিই প্রদীপ জ্বলিতে দেখা যাইত। ইহাতে তাঁহার এক সহচরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আনন্দমোহন বাবু কি সমস্ত রাত্রিই পড়েন?" সহচর উত্তর করিলেন, "আনন্দমোহন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আহার করিয়াই নিদ্রা যান। রাত্রি ৯টার সময় নিদ্রাত্যাগ করিয়া পড়িতে বসেন আর বেলা ৯টার সময়ে চেয়ার ছাড়িয়া উঠেন। এই সমস্ত সময়ে তাঁহাকে কেহ একবার হাই তুলিতেও দেখে না।" বস্তুতঃ যে কার্য্যে প্রীতি হয় তাহাতে নিদ্রা আসিতেই পারে না। রাত্রি ৩টা অবধি ত লোকে থিয়েটার দেখে, কে ঘুমায়?

একদিন একটী বন্ধু আনন্দমোহনের নিকট বলিতেছিলেন, "আমি অধিক পড়িতে পারিতেছি না। অধিক পড়িবার সামর্থ্য কমিয়াছে।" আনন্দমোহন উত্তরে বলিলেন, "অন্ততঃ দশ ঘণ্টা ত পড়েন?" আনন্দ মোহনের বিবেচনায় দশ ঘণ্টা পাঠ অতি সামান্য পাঠের মধ্যেই গণনীয়; ইহা পীড়াবস্থাতেও সম্পাদিত হইতে পারে। আনন্দমোহনের পাঠে এত অনুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি ভারতে প্রথমে র‍্যাঙ্‌লার হইতে পারিয়াছিলেন।

২। কলিকাতায় বৌবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের চতুর্থ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দাস (ডি, এন্ দাস) প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই তিনি মিল্‌টন, সেক্স্‌পিয়র্, বেকন্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সমস্ত গ্রন্থকর্ত্তার সমস্ত গ্রন্থই অবহিতচিত্তে অধ্যয়ন করেন। বাবু শ্রীনাথ দাসের প্রথমে বিশ্বাসই হয় নাই, অত অল্পবয়স্ক বালক কিরূপে অত দুরূহ পুস্তক বুঝিবে। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন পুত্র সমস্তই অবলীলাক্রমে অধিগত করিয়াছে, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

দেবেন্দ্রনাথের পাঠে এমন অনুরাগ ছিল, যে তিনি পাঠকালে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। যে দিন তাঁহার বিবাহ হয় সেই রাত্রিতে যাঁহারা বরযাত্রীরূপে তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার ভবনে আসিয়া তাঁহাকে অনেক অন্বেষণ করিলেন কিন্তু দর্শন মিলিল না। শেষে শুনিতে পাইলেন দেবেন্দ্রনাথ পাঠাগারে পাঠে নিমগ্ন হইয়া আছেন, বাটীর ভিতর হইতে মা লোকের উপর লোক পাঠাইয়া জানাইতেছেন, বর বাহির হইবার সময় উপস্থিত, বর সাজাইতে হইবে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পাঠে তন্ময়, তাহাদের আগ্রহবচন কাণে যাইতেছে বটে, কিন্তু শুনিবে কে?

দেবেন্দ্রনাথ পাঠার্থ কখনও রাত্রি জাগরণ করিতেন না। রাত্রি দশটার

আনন্দমোহন বসু

অধিক পড়িতেন না বটে কিন্তু তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত ছিল না। বিবাহ রাত্রিতেই যখন তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত হইল না, তখন অন্য সময়ে হইবার অল্পই সম্ভাবনা।

দেবেন্দ্রনাথের পাঠে অনুরাগ দেখিয়া পিতা শ্রীনাথ দাস তাঁহাকে অধ্যয়নার্থ বিলাতে পাঠাইয়া দেন। দেবেন্দ্রনাথও বিলাতে উচ্চ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া পিতার বাসনা পূর্ণ করেন।

৩। যাঁহারা বাল্যে ও যৌবনের প্রারম্ভে পাঠে অনুরাগ দেখাইতে পারিয়াছেন তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সেই পূর্ব্ব অনুরাগ স্বকর্ত্তব্য-কার্য্যে ঢালিয়া দিয়া, বহু অসাধ্য কার্য্য সুসাধ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আনন্দমোহন বসু যখন প্রথম ব্যারিষ্টার রূপে হাইকোর্টে মকর্দ্দমার এক পক্ষে বক্তৃতা করিতে থাকেন তখন জজ্ সাহেব দুর্ব্বোধ্য বিষয়ে বুঝাইবার নিপুণতা দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল, মিষ্টার আনন্দমোহন বাঙ্লার গৌরব।

যেদিন দ্বারকানাথ মিত্র উকীল হইয়া আদালতে প্রথম বক্তৃতা করিয়া একটী দুর্ব্বোধ্য বিষয় জলের মত বুঝাইয়া দিলেন সেদিন জজ সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? দ্বারকানাথ মিত্র যখন উত্তরে বলিলেন 'হুগলি কলেজ', তখন জজ্ সাহেব আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, 'হুগলি কলেজ আজ ধন্য হইল!'

যেদিন রাজঘাটের সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেশন মাষ্টার, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র মিত্র ই, আই, রেলওয়ের প্রথম সময়নিরূপণ পত্র* নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, সেই দিন রেলওয়ে অধ্যক্ষ তাঁহার বুদ্ধিপ্রখরতায় মুগ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়াছিলেন, শেষে বলিয়া উঠেন, "আপনি বাঙ্লার একটী অসামান্য রত্ন! আপনা দ্বারা আজ রেলওয়ে কোম্পানি যে কি উপকার লাভ করিল, তাহা প্রকাশ করিবার নয়।"

* Time table.

"যুধি বিক্রমঃ।"

(মহাত্মগণ যুদ্ধস্থানেই বিক্রম প্রকাশ করেন।)

অনেকেই ক্ষীণবলের উপরেই বিক্রম প্রকাশ করে। মহাত্মগণ নিজ ভৃত্যাদির উপর বিক্রম বিকাশ না করিয়া যুদ্ধ স্থানেই বিক্রম দেখাইয়া থাকেন।

১। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী পুত্রকে বলিলেন, "ঈশ্বর, অমুক দিন বাড়ীতে যে কাজ হইবে তাহাতে তোকে আসিতেই হইবে, ছুটী পাইলাম না বলিয়া না আসিলে আমি মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার আদেশ মাথায় করিয়া লইলেন ও বলিলেন, "মা, আমি নিশ্চয়ই ঐ দিবস তোর পাশে আসিয়া উপস্থিত হইব। এ বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাকিস্।". বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

পুত্রের বাক্যে মাতা নিশ্চিন্তমনে রহিলেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিবসে পুত্রের দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ পুত্র মায়ের কাছে কখনই মিছা কথা কহে নাই বলিয়া তাঁহার মনে হইল পুত্র নিশ্চয়ই বিপদে পড়িয়াছে। তিনি পুত্রের জন্য দেবতাদিগের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সে দিবসের কার্য্য তাঁহার ভালই লাগিল না। ঈশ্বর না আসিলে জলগ্রহণ করিব না বলিয়া সমস্ত দিন উপবাসে কাটাইলেন ও নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে ছুটি না পাওয়াতে, নিয়মিত কার্য্যসম্পাদনান্তে মাতৃদর্শনার্থ আকুল হইয়া পদব্রজেই যাত্রা করিলেন। তখন তাঁহার গতি দেখে কে? গাড়ী করিয়া যাইলে বিলম্ব হইবে,

কারণ ঘোড়া মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিবে, পদব্রজে যাইলে বিলম্ব হইবার ভয় নাই বলিয়া ছুটিতে লাগিলেন। সে দিন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ। দৈবের সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজ নহে, কাহার জয় হয় তাহা নির্ণয় করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

দৈবের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে দামোদর নদের তীরে উপনীত হইলেন। নদ পার হইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই মাতৃদর্শন হইবে ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু এবারে দৈব নিজের যতটুকু সামর্থ্য ছিল সমস্তই অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গতির ব্যাঘাত দিল। দামোদর উদ্ধততরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্তে ভয়ের সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিল। দৈববশে পারাণী নৌকাসহ পরপারে ছিল, সুতরাং এপারে নৌকা আসিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

যুদ্ধে যখন শত্রু জয়োন্মুখ হয় তখন মহাত্মগণের বিক্রমের যথার্থ স্ফূরণ হয়। এই যুদ্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে বিক্রম প্রকাশ হইল তাহা দেখিয়া বোধ হয় আকাশচারী দেবগণ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন দেখিলেন দামোদর পারের কোন উপায় নাই, তখন তিনি মল্লের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিলেন, বোধ হইতে লাগিল যেন দামোদরের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দামোদরের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ও পার হইবার জন্য সন্তরণ দিতে লাগিলেন। হিংস্র জলজন্তুর ভয় তাঁহার হৃদয়ে একবিন্দুও স্থান পাইল না। এইবারে দৈব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হার মানিলেন। দেহে অগাধ বল থাকাতে তিনি অত বড় নদ সাঁতরাইয়া অবসন্ন হইলেন না। তিনি পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ভিজা কাপড়েই বাড়ীর দিকে ছুটিলেন ও গৃহে উপনীত হইয়া, "মা কোথায়, মা কোথায়" জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, যেখানে মাতা বসিয়া কাঁদিতেছিলেন ও দেবতাদিগের নিকট মাথা কুটিতেছিলেন, সেই স্থানেই

উপস্থিত হইয়া “ওমা, আমি এসেছি, আর তোরে কাঁদিতে হইবে না” বলিয়া মাতৃচরণে গড় করিলেন। জননী আলুথালু বেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোলে তুলিয়া লইলেন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, আনন্দে অনেকক্ষণ তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না।

২। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পাঠাবস্থায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি যে বারে এল্, এ, পরীক্ষা দিবেন, সেই বৎসর কতকগুলি ঘটনাচক্রে তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত হয়। সুতরাং টেষ্ট্ পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য্য হন। কলেজের অধ্যাপক মহোদয়গণ বারণ করিয়া বলিলেন, “শিবনাথ, তুমি এ বৎসর ইউনিভার্সিটীতে পরীক্ষা দিতে যাইও না। তোমার যে সুনাম আছে তাহার লোপ হইবে।” শাস্ত্রী মহাশয় অধ্যাপক মহোদয়গণকে বলিলেন “এখনও ত একমাস সময় আছে, এই এক মাস সময়েই আমি সমস্ত অধিগত করিতে পারিব।” শাস্ত্রী মহাশয়ের জিদ দেখিয়া তাঁহারা অগত্যা ইউনিভার্সিটীতে নাম পাঠাইয়া দিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এই একমাস কাল কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া গেল শাস্ত্রী মহাশয় তাহা জানিতেই পারিলেন না। এই সময়ে তাঁহার পাঠে এরূপ অনুরক্তি হইয়াছিল যে, যে দেখিয়াছিল সেই অবাক্ হইয়াছিল। তিনি দিনের ২৪ ঘণ্টা ভাগ করিলেন। নিদ্রাতে দুই তিন ঘণ্টা, ও স্নান আহার মুখ প্রক্ষালনাদিতে পনর মিনিট মাত্র ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত সময়, ইংরাজিতে, অঙ্কে, ইতিহাসে, লজিকে (ন্যায়শাস্ত্রে), ফিলজফিতে (দর্শনে) ও সংস্কৃত প্রভৃতিতে নিয়মমত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। যে পুস্তকখানি পড়িতে ভাল লাগিত না, জিদ থাকাতে তাহা ভাল লাগাইয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে পাঠে তাঁহার এমন প্রণিধান হইতে লাগিল যে তিনি নিজেই অবাক্ হইতে লাগিলেন। পরীক্ষা যতই নিকট হইতে লাগিল

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

নিদ্রা ততই কমিতে লাগিল। তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিদ্রা ও অন্যমনস্কতা একেবারে পরাজিত হইল। এত অনিয়মে কোথায় স্মরণশক্তি কমিয়া যাইবে, তাহা না হইয়া বরং অসামান্যরূপে বাড়িয়া গেল। তিনি পরীক্ষা দিলেন, ও পরীক্ষায় কৃতকার্য্যদিগের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেন। সংস্কৃত ও ইংরাজিতে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিলেন। ইংরাজীর পরীক্ষক ক্রফট্ সাহেব তাঁহার কাগজখানি দেখিয়া যে প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। ইংরাজিতে ডব্‌স্ বৃত্তি পান ও আরও দুইটী বৃত্তি পান। এই একমাস কাল পাঠের সহিত যুদ্ধে যে বিক্রম দেখাইয়াছিলেন তাহা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

শান্তি স্থাপন।

বারাসাতের নিকট কোনও এক গণ্ডগ্রামে দুই ভদ্রলোকের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। তজ্জন্য উঁহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। আত্মীয় স্বজন যোগ দিয়া ঐ বিবাদকে শত্রুতায় পরিণত করিল। পরস্পরের যে কেবল মুখদর্শন রহিত হয় তাহা নহে, মধ্যে মধ্যে দাঙ্গা পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। গ্রাম মধ্যে দুইটী দলের এমন অবস্থা হইল, যে সমস্ত গ্রামের শোচনীয় দশা উপস্থিত হইল। এক মাননীয় সাধুস্বভাব ভদ্র ব্যক্তি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবাদ ভাঙ্গিবার জন্য প্রধান বিবাদ-কারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বিবাদকারী ইঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি ইঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া সাদরে সম্ভাষণ করিলেন ও 'আমার গৃহ আজ পবিত্র হইল' বলিয়া তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার আতিথ্যক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ও শেষে সবিনয়ে তাঁহার উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভদ্র ব্যক্তি একথা সে-

কথার পরে তাঁহার সহিত যাঁহার বিবাদ তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বিবাদকারী এই বাক্যে একেবারে নিরুত্তর হইয়া সানুনয়ে বলিতে লাগিলেন, মহাশয়, আপনাকে আমি গুরুর মত ভক্তি করি, আপনি এই অন্যায় অনুরোধ করিলে আপনার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধাটুকু আছে তাহা আর থাকিবে না। অতএব আপনি এবিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া অন্য বিষয়ের আলাপ করুন।

ভদ্র ব্যক্তি ইহাতে নিরুত্তর না হইয়া, যাহাতে বিবাদ মিটিয়া যায় তাহার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে উদ্যত হইলে, বিবাদকারীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, শেষে এত ক্রোধোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন যে ক্রোধে বলিয়া ফেলিলেন, "আপনি যদি ফের এরূপ অনুরোধ করিবেন তবে আপনাকে প্রহার করিব।" ভদ্র ব্যক্তি ইহাতে বিরত হইবার নহেন, তিনি উক্ত বিবাদে গ্রাম শ্মশান সদৃশ হইয়া পড়িয়াছে, বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া বার বার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বিবাদকারীর ক্রোধ এবারে ভদ্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিল, তিনি পাদস্থিত জুতা উন্মুক্ত করিয়া এমন প্রহার আরম্ভ করিলেন যে সমুপাগত সমস্ত ব্যক্তি বিমূঢ় হইয়া একেবারে কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল; এবং প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই, "হায় কি সর্ব্বনাশ ঘটিল! এমন মাননীয় ব্যক্তির পাদুকাঘাত হইল!" বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

ভদ্র ব্যক্তি পাদুকা দ্বারা আহত হইয়া, আহত স্থান হইতে ধূলি ঝাড়িলেন, এবং আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিলেন "বিবাদ মিটিয়াছে। আমার আজ কি সৌভাগ্য! আমি আজ যে বিবাদ প্রশমার্থ এখানে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে সেই বিবাদ একেবারে মিটিয়া গেল।" সমুপাগত ব্যক্তিবর্গ বলিয়া উঠিলেন, "সে কি মহাশয়, মিটিল কিসে? আমরা এত দিন এই বিবাদকারীর পক্ষে ছিলাম, কিন্তু আপনার প্রতি এই অভদ্র ব্যবহার দেখিয়া আমরা ইঁহার সংসর্গ ত্যাগ করিলাম। আরও

বিবাদ জ্বলিয়া উঠিল, অন্যদলে আমরা যোগ দিয়া ইঁহার সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিব।"

ভদ্র ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন আপনারা জানেন, প্রদীপ নিবিবার পূর্ব্বে একবার অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠে; ইঁহার ক্রোধ যখন এরূপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে যে, ইনি যাহাকে চিরদিন গুরুর মত মান্য করিয়া আসিয়াছেন, তাহার মস্তকে পাদুকা আঘাত করিলেন, তখন ইঁহার ক্রোধ চরম সীমায় উঠিয়াছে, স্বীকার করিতেই হইবে। এক্ষণে এই ক্রোধ এমন নির্ব্বাণ হইবে যে উঁহার সহিত যাঁহার বিবাদ তাঁহার উপরও আর ক্রোধ থাকিবে না।

এই কথা বলিয়া ভদ্র ব্যক্তি আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন, অবমানকারীও, "হায়! কি করিলাম, আমার গুরুবৎ মাননীয়কে পাদুকাঘাত করিলাম! ইহার যে প্রায়শ্চিত্ত নাই!! যে ক্রোধ আমাকে এরূপ অসৎ পথে প্রবর্ত্তিত করিল, আজ আমি তাহাকেই ত্যাগ করিলাম। যখন ক্রোধকে ত্যাগ করিলাম, তখন সেই ক্রোধের প্রধান আশ্রয়স্বরূপ আমার যে শত্রু তাহার প্রতিও ক্রোধ ত্যাগ করিলাম। শত্রুর প্রতি যখন আমার ক্রোধ রহিল না, তখন তাঁহাকে মিত্রবৎ আজি আলিঙ্গন করিয়া ও তাঁহার পায়ে ধরিয়া, এক্ষণে যাঁহাকে অবমান করিলাম, তাঁহার পদধূলি দুইজনে লইব। ক্রোধ, এতদিন তুমি আমাকে নানা বিপথে লইয়া গিয়াছ, এক্ষণে যাইবার সময় আমার সমস্ত পাপ কাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে আমার কি যে আনন্দ হইতেছে তাহা যাঁহাকে আজ অবমান করিয়াছি, তাঁহার চরণে যতক্ষণ না নিবেদন করিতেছি, ততক্ষণ আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন ও অন্য বিবাদকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন, ও পূর্ব্বোক্ত ভদ্র ব্যক্তির আলয়ে গিয়া, তিনি "বিবাদ মিটিয়াছে" এই যে বেদবাক্য বলিয়া আসিয়াছেন তাহার প্রমাণ দিয়া গ্রামে পুনঃ শান্তিস্থাপন করিলেন। সকলেরই মনে আনন্দোচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল।

"পতির্হি দেবতা স্ত্রীণাম্।"

পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা।

বিক্রমপুরে একটী বিষয়ী যুবক বাস করিতেন। তাঁহার যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে নিজ সংসারের ব্যয় সচ্ছলে নির্ব্বাহিত হইত। অবস্থা উত্তম থাকাতে তিনি বিবাহ করিলেন ও পত্নীকে গৃহে আনিয়া সংসার ধর্ম্ম আচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ও ৺ কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি দশাশ্বমেধের ঘাটে সর্ব্বদাই বসিয়া থাকিতেন ও লোকে অনুগ্রহ করিয়া যাহা খাওয়াইয়া দিত তাহাই ভক্ষণ করিতেন। প্রতিদিন দুই তিনবার গঙ্গাস্নান করিতেন ও মনে মনে সাধন-ভজন করিতেন। ক্রমে তাঁহার এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যে তাঁহার পরিধান বসন পর্য্যন্তও পরিত্যক্ত হইল। তিনি সর্ব্বদাই উলঙ্গ হইয়াই থাকিতেন, এই জন্য তাঁহাকে লোকে 'নেঙটা বাবা' বলিতে লাগিল।

ষোড়শবর্ষীয়া পত্নী স্বামীর কোন উদ্দেশ না পাইয়া, সর্ব্বদাই বিষন্ন মনে থাকিতেন। শেষে একদিন শুনিতে পাইলেন তাঁহার পতি ৺কাশীধামে দশাশ্বমেধের ঘাটে উলঙ্গ অবস্থায় মৌনী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ যখন করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া আনিবার কোনই আশা নাই ভাবিয়া, পত্নী একেবারে নিরাশ হইলেন বটে, কিন্তু স্বামী দর্শন অসম্ভব নয় ভাবিয়া তাঁহার দর্শনেই আত্মা চরিতার্থ করিবার মানসে ৺কাশীধামে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

তিনি স্বামিদর্শনার্থ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়াতে তাঁহার এ উদ্যমে কেহই বাধা দিতে পারিল না। তিনি ৺কাশীধামে দশাশ্বমেধের ঘাটে আসিয়া স্বামীকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্ত হইলেন ও কিসে স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিবেন তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। স্বামী মৌনী, তিনি যেমন অন্যের সঙ্গেও কথা কন না, পত্নীর সহিতও কথা কহিলেন না, এবং তিনি যে পত্নীকে চিনিতে পারিলেন তাহারও কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন না।

পত্নী স্বামীর এই আচরণে কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখিত হইলেন না, বরং সাক্ষাৎ দেবতাকে যেরূপ আগ্রহের সহিত দর্শন করা উচিত, তিনি সেই ভাবেই স্বামীকে দেখিতে লাগিলেন। কুলবধূর প্রকাশ্য ভাবে অবস্থান শোভা পায় না দেখিয়া এক কৃপালুহৃদয় ব্যক্তি তাঁহারে এমন একটী গৃহ ছাড়িয়া দিলেন যেখান হইতে স্বামীকে আর চক্ষের আড়াল করিতে হইবে না। পত্নী সেই গৃহটী পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন। তিনি সেই গৃহে বসিয়া দিবারাত্র অতৃপ্ত নয়নে স্বামী দর্শন করিতে লাগিলেন। স্বামি-দর্শন ভিন্ন তাঁহার আর দ্বিতীয় কার্য্য নাই। স্বামীর আহারান্তে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করেন, ও সমস্তক্ষণই তাঁহার দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকেন।

একদিন নেঙ্টা বাবার পীড়া দেখা দিল। তাঁহাকে যাঁহারা ভক্তি করিতেন তাঁহারা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পত্নী স্বামী-শুশ্রূষার্থ তাঁহাদের অনুমতি লইলেন ও স্বামীর অশেষবিধ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই পীড়াই সাংঘাতিক হইল। নেঙ্টা বাবা পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিলেন। ভক্তগণ সন্ন্যাসব্রতাবলম্বীর যে সমস্ত কার্য্য করা উচিত তাহা সম্পন্ন করিলেন ও তাঁহার স্থানে তাঁহার এক খানি চিত্র সন্নিবেশিত করিয়া প্রতিদিনই সেই চিত্রের পূজা করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে পত্নী সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরিয়া সেই গৃহে সেই স্থানে সেই ভাবেই স্বামীর চিত্রের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এক্ষণে দ্বিতীয় কার্য্য নাই, কেবল স্বামীর চিত্রদর্শন। তিনি যে ভাবে চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা দেখিলে চিত্তে পুণ্যের সঞ্চার হয়, চক্ষু জলে প্লাবিত হইয়া উঠে। বলিতে কি, উক্ত রমণীর অবস্থানে দশাশ্বমেধের ঘাটটী পুণ্য-প্রস্রবণের উৎস হইয়া রহিয়াছে। খৃঃ অব্দ ১৯১৩।

অদৃশ্যভাবে পরোপকার।

কলিকাতার অন্তর্বর্ত্তী ভবানীপুরে এক ধনবান্ বাস করিতেন। তিনি ব্যবহারাজীবের কার্য্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, এবং সেই অর্থ নির্ধন অনাথের সেবায় নিয়োজিত করিতেন। তিনি যাঁহাকে অর্থের সাহায্য করিতেন তিনি যাহাতে কিছুই জানিতে না পারেন, তাহার দিকেই তাঁহার সর্ব্বদাই দৃষ্টি থাকিত। সেই জন্য তিনি নিজ নাম না দিয়া ডাকের পত্রেই নোট পাঠাইয়া বিপন্নের সাহায্য করিতেন। যথার্থ বিপন্ন কাহারা, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে রাত্রিতে নিজপল্লী মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, এবং যেখানে কাতরধ্বনি সেই খানেই অদৃশ্যভাবে থাকিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানে যখন বুঝিতেন যে ইহাই সাহায্যের যথার্থ যোগ্যস্থল তখন তিনি অজ্ঞাতসারে তাহার সাহায্য করিতেন। যাহার পুত্র রোগ-শয্যায়, অথচ ডাক্তার ডাকিবার ক্ষমতা নাই, কেবল দীর্ঘ-নিশ্বাস, তথায় তিনি ডাক্তার ও ডাক্তারের ঠিকানায় ঔষধ পাঠাইয়া দিতেন। লোকে মনে করিত ডাক্তার বিনা মূল্যে ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু তাহার মূলে যে এই স্বর্গীয় ব্যবহারাজীব আছেন, তাহার সন্ধান পাইত না।

দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে পূজার দিন এক বিষম দিন। এই সময়ে সকলেরই পুত্র কন্যা নানারঙের বস্ত্র পরিধান করে, দরিদ্রের পুত্র কন্যাগণ "ওমা আমি রাঙা কাপড় পরিব" বলিয়া ক্রন্দন করে ও নির্ধন পিতা মাতাকে কাঁদায়। এই সময়ে উক্ত ব্যবহারাজীব বাড়ী বাড়ী সন্ধান লইতেন, 'কোন্ দরিদ্রের বালক বালিকাগণ বস্ত্রের জন্য কাঁদিতেছে।' যে দিন তাঁহার কাণে গেল অমুক পর্ণকুটীরে অনাথা মাতা সন্তানের ক্রন্দনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই রাত্রিশেষে তাঁহার গৃহের দ্বারের সম্মুখে তাঁহার পুত্র বা কন্যার জন্য পূজার উপযোগি নূতন বস্ত্র সজ্জিত পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। যখন অনাথা জননী প্রভাতে দ্বার খুলিবামাত্র সন্তানের নববস্ত্র দেখিয়া "কে বাবা, আমার ছেলের উপর দয়া করিয়া তাহার কান্না থামাইলে?" বলিয়া কাহাকে যে আশীর্ব্বাদ করিবেন তাহা খুঁজিয়া না পাইয়া "যে মহাত্মা অনাথার দিকে চাহিয়াছ, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন" এই বলিয়া উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকেন ও আনন্দে গলদশ্রু হইয়া, "খোকা, এই তোর কাপড় কোন দেবতা দিয়া গিয়াছে" বলিয়া খোকার বদনকে প্রফুল্লিত করিতে থাকেন, তখন সেই দৃশ্য স্বর্গীয় বলিয়া মনে হয়। অনাথা জননি, তুমি যে খোকাকে বলিলে "কোন দেবতা বস্ত্র দিয়া গিয়াছে" ইহা যথার্থ বলিয়াছ। এরূপ লোক মনুষ্যপদবাচ্য নহেন। ইনি বস্তুতঃ সাক্ষাৎ দেবতা।

চাকরীর প্রতি ঘৃণা।

যৎকালে বাবু সোমনাথ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময়ে একদিন তাঁহার গুরুদেব তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন। বাবু সোমনাথ গুরুদেবকে পাইয়া মহা আনন্দে বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব, আপনি যথাসময়ে এখানে আসিয়াছেন। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে একটী অধ্যাপকের পদ শূন্য হইয়াছে। আপনার ন্যায় সুপণ্ডিত আমার চক্ষে আর পড়িতেছে না, সুতরাং আপনি এই কার্য্য গ্রহণ করিলে সংস্কৃত কলেজ গৌরবান্বিত হইবে। এই পদের যথেষ্ট বেতন আছে। আপনি অনুমতি করুন, আমি আপনার জন্য এই পদটী রাখিয়া দি।"

গুরুদেব সোমনাথের বাক্যে কোনও রূপ উত্তর না দিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন ও শেষে একটু সুবিধা পাইয়া পলাইয়া একেবারে নিজ গ্রামে নিজ ভবনে উপস্থিত হইলেন। পত্নী স্বামীকে এত শীঘ্র শিষ্যের বাটী হইতে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগো, শিষ্যের বাটী হইতে এত শীঘ্র যে ফিরিলে?" তিনি ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন "আমি আর সোমনাথের মুখদর্শন করিব না। তাহার এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমাকে চাকরী করিতে বলে? বিদ্যাদান করাই আমাদের ধর্ম্ম, সে আমাকে এই ধর্ম্ম হইতে স্খলিত করিবার জন্য বিদ্যা বিক্রয় করিতে বলে?"

চাকরীর প্রতি রমণীর বিদ্বেষ।

স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থায় গণিতে এম্. এ. ও প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্টসিপ্ পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষকদিগের চিত্ত এরূপ আকর্ষণ করিলেন, যে তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের প্রশংসাবাদে প্রণোদিত হইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অভিভাবকগণ তাঁহাকে পর বৎসরেই এম্, এ, পরীক্ষক করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না।

গুণের প্রতি এই অপূর্ব্ব সমাদরে সকলেরই দৃষ্টি স্যার্ আশু-তোষের উপর পতিত হইল। শিক্ষা বিভাগের নেতা, যাহাতে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, সেই জন্য তাঁহাকে সমাদরে আহ্বান করিলেন ও প্রথমেই সাধারণ-দুর্লভ্য বেতন দিতে স্বীকার করিলেন। তৎকালে স্যার্ আল্‌ফ্রেড্ ক্রফট্ শিক্ষা-বিভাগের নেতা। তিনি শ্রীমান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস আশুতোষ, গণিতে তোমার অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া তাহার পুরস্কারের জন্য বহু বেতনের একটী কর্ম্ম দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। তুমি এই কার্য্য গ্রহণ করিয়া গণিতে আরও প্রতিভা দেখাও।

ক্রফট্ সাহেব ভাবিয়াছিলেন, শ্রীমান্ আশুতোষ এই প্রস্তাবে মহা আনন্দ প্রকাশ করিবেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, আনন্দের চিহ্ন না দেখাইয়া চাকরির প্রতি বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন, আমার পিতৃদেবের অনুমতি না পাইলে আমি কিছুই বলিতে পারিতেছি না, তখন তিনি মহা বিরক্ত হইয়া, কিয়ৎকাল পরে সমাগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বলিলেন, "ন্যায়রত্ন মহাশয়, আমি আশু-তোষকে এতবড় একটা চাকরি দিতে চাহিলাম, সে তাহা গ্রাহ্যও করিল

না!” ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, “সাহেব, আমি তাহার পিতার মত করিয়া শীঘ্রই আশুতোষকে আনিয়া দিতেছি।”

ন্যায়রত্ন মহাশয় তদনুসারে শ্রীমান্ আশুতোষের পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণান্তে যখন দেখিলেন, পিতা পুত্র উভয়েরই এক মত, তখন তিনি মহা দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

স্যার্ আশুতোষ বি, এল্ পরীক্ষা দিয়া হাইকোর্টে প্রবেশ করিলেন ও ওকালতিতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন। হাইকোর্টের প্রধান উকীল শ্রীনাথ দাস ইঁহার কার্য্য-দক্ষতায় এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, কোনও এক মকর্দ্দমার সময় পীড়িত হওয়াতে, তাঁহার মক্কেলকে বলিয়াছিলেন, “এ মকর্দ্দমা শীঘ্র বুঝিতে ও চালাইতে একমাত্র আশুতোষই আছেন, যাও, তাঁহার শরণাগত হও।”

এইরূপ ব্যবহারাজীবের দক্ষতা প্রচারিত হইলে তাৎকালিক গবর্ণর জেনারেল স্যার্ আশুতোষকে হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে বসাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে যথা সময়ে পত্রও উপস্থিত হইল।

শ্রীমান্ আশুতোষ পত্র লইয়া মহা আনন্দে মাতার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “মা, গবর্ণমেণ্ট্ আমাকে হাইকোর্টের জজ্ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, এই পত্র আসিয়াছে।”

মাতা চকিত হইয়া বলিলেন, “বৎস আশু, চাকরিতে চিরকাল ঘৃণা দেখাইয়া এক্ষণে কি কারণে উহাতে আনন্দ দেখাইতেছ? যদি বল ৪০০০৲ টাকা ও বহু সম্মান। তুমি ত গত মাসে চারি হাজারের অধিক টাকা আমার হাতে আনিয়া দিতে পারিয়াছ? যদি বল ‘অনেক সম্মান,’ তাহা আমি স্বীকার করি না। যতই সম্মান হউক না, উহা চাকরি বই আর কিছুই নয়! পরের অধীনতাতে সম্মান মনে করাই ভ্রম।”

মা গরিবের ঘরের মেয়ে হইলে কি হইবে! সুব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজঃ

তাঁহার শোণিতে প্রবাহিত, তিনি কি ব্রাহ্মণত্বের অন্যথাচরণ দেখিতে ভাল বাসিতে পারেন? শ্রীমান্ আশুতোষ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "মা, তুমিত জান, পিতাঠাকুর বলিতেন, যদি চাকরি করিতে হয়, তবে হাইকোর্টের জজিয়তি। তাহা ছাড়া অন্য চাকরি করিতে নাই। তাঁহার চিরজীবন ইচ্ছা ছিল, আমি হাইকোর্টের জজ্ হই। তাঁহার বাসনা বিফল করিতে ইচ্ছা হয় না।" মাতা অনেকক্ষণ ভাবিলেন, শেষে বলিলেন, "যদি তাঁর ইচ্ছা ছিল, তবে এ চাকরি স্বীকার করগে।"

স্যার্ আশুতোষ মাতার অনুমতি পাইয়া গবর্ণমেণ্টে স্বীকারপত্র প্রেরণ করিলেন। পরিবারের মধ্যে সকলেরই আনন্দ, কেবল মাতার মনে আনন্দ নাই। রাত্রি প্রভাত হইল, মাতা শ্রীমান্‌কে ডাকিলেন, এবং ক্ষোভ ও দুঃখের সহিত পুনরায় বলিলেন, "বৎস, আমি সমস্ত রাত্রি ভাবিয়াছি। চাকরি করা হইবে না।"

পুত্র আকাশ হইতে পড়িলেন। "সেকি মা, কল্য যে গবর্ণমেণ্টে স্বীকার-পত্র লিখিয়া দিয়াছি! স্বীকার করিয়া যদি অস্বীকার করি, গবর্ণমেণ্ট আমাকে কি বিবেচনা করিবে? আমাকে অব্যবস্থিতচিত্ত মনে করিয়া যে ঘৃণা করিবে! বিশেষতঃ স্বীকার পত্র পাইয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলে তৎপরে প্রত্যাখ্যান পত্র পাইলে, তাঁহাদের অনেক অসুবিধা ঘটিবে।"

মা বলিতে লাগিলেন, "বৎস, তোমার পত্র সিম্‌লায় পৌঁছিতে অন্ততঃ দুই দিনও ত লাগিবে, কিন্তু আজই টেলিগ্রাফ্ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করিলে তাঁহারা তোমার সম্বন্ধে আর কোনও ব্যবস্থা করিবেন না।"

পুত্র বলিলেন, "মা, সে কথা সত্য, কিন্তু আমার স্বীকার-পত্র পরে ত পাইবেই। তখনত আমার অব্যবস্থিত-চিত্ততার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবে!" মা আর কি করেন, অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু ভৃত্যভাবের প্রতি সদ্‌ব্রাহ্মণের যে স্বাভাবিক বিদ্বেষ, তাহার তিরোভাব হইল না।

চাকরীর প্রতি বিতৃষ্ণা।

পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্করত্ন নদীয়ার মধ্যে একজন প্রধান মাননীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ৺কাশীধামে বাস করিতে যান। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, এই কালে ৺কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। তিনি তর্করত্ন মহাশয়ের উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ভেনিস্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের বহু প্রশংসা করিয়া তাঁহার জন্য একটী অধ্যাপকের পদ যোগাড় করিলেন ও আনন্দের সহিত তর্করত্ন মহাশয়কে বিজ্ঞাপন করিলেন। তর্করত্ন মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ন্যায়রত্ন মহাশয়, আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ কিন্তু আমি চাকরী করিব না। চাকরী করিলে আমি সাধ পূরিয়া পূজা আহ্নিক করিতে পারিব না। যে কার্য্যে দেবপূজার ব্যাঘাত হয় সে কার্য্য করিতে পারিব না। ৺কাশীতে অতি অল্প ব্যয়েই জীবন ধারণ হয়। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা আমার সঞ্চিত আছে, সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের পূজা ও তৎসম্বন্ধে কথা বার্ত্তাতেই দিন কাটাইতে পারিব। অধিক অর্থের কিছুই প্রয়োজন দেখি না। আমি সাধ পূরিয়া ভগবানের আরাধনা করিব এই আশায় ৺কাশীধামে আসিয়াছি। আমার এই সাধে যাহাতে ব্যাঘাত না পড়ে আপনি তাহাই করুন।" ন্যায়রত্ন মহাশয় তর্করত্ন মহাশয়ের প্রত্যাখ্যানে প্রথমে একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা অনুভব করিয়া সবিস্ময়ে তাঁহাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

"সদসি বাক্‌পটুতা"।

(বহুলোকের সমক্ষে বাক্যের নিপুণতা।)

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে কাহার ক্ষমতা অধিক? যথার্থ উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, সরস্বতীর ক্ষমতার সীমা নাই। বাঙ্‌নৈপুণ্যে যত ক্ষমতা লাভ করা যায়, ধনে তত হয় না। ধনদানে অদ্য যাহার উপকার করা যায়, কল্য যদি আবার সে ধনপ্রার্থী হইয়া ফিরিয়া যায়, তবে সে পূর্ব্বকৃত উপকার একেবারে বিস্মৃত হইয়া শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় এক ব্যক্তির মুখে যখন শুনিলেন "অমুক লোক আপনার বড়ই নিন্দা করে," তখন তাঁহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "সে ব্যক্তির ত কখনও অর্থসাহায্য করি নাই, তবে কেন আমার নিন্দা করিবে?"

বস্তুতঃ ধনলাভে উপকৃত ব্যক্তি পুনর্ব্বার অর্থসাহায্যে বঞ্চিত হইলে কৃতঘ্ন হইয়া পড়ে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর ভাইস্ চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট এক ব্যক্তি পরীক্ষক হইতে পারিয়াছেন কিনা জানিতে গিয়া শুনিলেন তিনি পরীক্ষক না হইয়া অপর এক ব্যক্তি হইয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "বেশ, আপনার আর একজন শত্রু বাড়িয়া গেল। আপনি ভাবিতে পারেন আমি শত্রু হইলাম, কিন্তু তাহা নহে। আমি ভবিষ্যতের আশায় থাকিয়া সুহৃদ্‌ই থাকিলাম, কিন্তু যে ব্যক্তি পরীক্ষক হইলেন তিনি দুই এক বৎসর পরে উচ্চ পরীক্ষায় পরীক্ষক হইতে না পাইলে আপনার শত্রু হইবে।" কথাটী সম্পূর্ণ সত্য না হউক, একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু বাক্যের সাহায্যে যে উপকার করা যায় তাহাতে শত্রুতা নাই। বাক্যের ক্ষমতা অতুল। জুলিয়াস

সীজার একটী কথাতে নিজ সৈন্যদিগের বিদ্রোহিতা শান্ত করিতে পারিয়াছিলেন। সৈন্যগণ, বেতন বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মঘট করে, বেতন বৃদ্ধি না হইলে সকলেই কর্ম্মত্যাগ করিব বলিয়া সিজারের নিকট আবেদন করে। সিজার আবেদন পত্র পাইয়া তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া, সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে নগরবাসিগণ!' এই ভাবে সম্বোধন শুনিবামাত্র সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল 'আপনি আমাদিগকে সর্ব্বদা যে কথায় সম্বোধন করেন তাহা ছাড়িয়া সাধারণ ভাবে সম্বোধন করাতে বুঝা গেল আমরা আর সৈন্যমধ্যে গণনীয় নহি। আমরা ত এখনও কর্ম্মত্যাগ করি নাই, তবে কেন আমাদের প্রতি এরূপ সম্বোধন করিলেন? আমরা আবেদন পত্র সংহরণ করিলাম, আপনি আমাদিগকে পূর্ব্ববৎ সম্বোধন করুন।"

১। একদিন এক পল্লীগ্রামবাসী গঙ্গাস্নানার্থ কলিকাতায় পুলের ঘাটে উপস্থিত হইয়া এক উড়িয়া ব্রাহ্মণের নিকট কাপড় রাখিয়া তাহার নিকট তৈল চাহিবার জন্য সম্বোধন করিয়া বলে, "মালী, একটু তেল দেও"; সেই ব্যক্তির ধারণা ছিল উড়িয়া মাত্রকেই মালী বলিয়া সম্বোধন করা যায়। ব্রাহ্মণ 'মালী' সম্বোধনে এত ক্রুদ্ধ হইল যে তাহার সমুদয় আত্মীয়দিগকে এই কথা জানাইয়া ফেলিল। তাহারা সকলেই 'মার মার' বলিয়া লাঠি হস্তে আসিয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল। টাকী নিবাসী প্রভাতচন্দ্র রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে, কি হইয়াছে?' তাহারা বলিল দেখুন দেখি মহাশয়, এই লোকটার কত বড় আস্পর্দ্ধা, এ ব্যক্তি আমাদিগকে 'মালী' বলে! প্রভাত রায় বলিলেন "তাহা কি হইতে পারে? তোমরা সুব্রাহ্মণ, তোমাদিগকে মালী বলিবে কেন? কি শুনিতে কি শুনিয়াছ, ও ব্যক্তি তোমাদিগকে 'মালীক' বলিয়াছে। তোমরাই ঘাটের মালীক, তাই 'মালীক' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে।" প্রভাত রায়ের এই বাক্যে সমস্ত উড়িয়া ব্রাহ্মণ জল হইয়া গেল।

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন

২। রামনারায়ণ তর্করত্ন একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতায় ছাতু বাবুর বাটীতে বিদায় * লইতে যান। ছাতু বাবু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিতেছিলেন। এক ব্রাহ্মণকে ছাতুবাবু তিনটী টাকা ও একখানি পিত্তলের থালা বিদায় দিলেন। ইঁহার পর তর্করত্ন মহাশয়ের পালা পড়িল। ছাতুবাবু তর্করত্ন মহাশয়কে দুইটী টাকা ও একখানি থালা বিদায় দিলেন। তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন বাবু, আপনি পূর্ব্ব ব্রাহ্মণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া আমার প্রতি পক্ষপাত † করিলেন? ছাতুবাবু বড়ই গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি তর্করত্ন মহাশয়ের বাক্‌চাতুর্য্য বুঝিয়া বলিলেন, "আপনি কি চান্?" তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, "আমার প্রতি পক্ষপাত না করিয়া পূর্ব্ব-ব্রাহ্মণের ন্যায় আমার প্রতিও নেত্রপাত করেন।"

ছাতুবাবু বলিলেন, 'নেত্র ত মানুষের নাই? তিন নেত্র ত মহাদেবের।' তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, আপনাকে 'আশুতোষ' বলিয়াই ত জানি। তবে নেত্রের অভাব কেন হইবে? বরং ত্রিনেত্র স্থানে পঞ্চদশ নেত্রের সম্ভাবনা। ছাতুবাবুর রাশনাম 'আশুতোষ' ছিল। আশুতোষ মহাদেবের নাম, মহাদেবের পঞ্চমুখ, প্রতি মুখে ত্রি নেত্র হেতু পঞ্চদশ নেত্র। তর্করত্ন মহাশয়ের এই বাক্‌কৌশলে ছাতুবাবু আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চদশ নেত্র স্থানে পঞ্চদশ মুদ্রা ও এক প্রকাণ্ড ঘড়া বিদায় দিয়া মহা আনন্দে তাঁহার পদধূলি লইলেন ও চিরদিনের জন্য তাঁহার সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

৩। একদিন কলিকাতায় এক ধনবান্ ব্যক্তি অনেকগুলি ভদ্র-সন্তানকে বাড়িতে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করেন। ধনবান্ নানাবিধ খাদ্যের

* পারিতোষিক, পাণ্ডিত্যের পারিতোষিক। "লঙ্কা দগ্ধা ময়া দেবি বিদায়ো দীয়তামিতি॥" মহানাটক।

† পক্ষ বলিলে 'দুই' বুঝায়, নেত্র বলিলে 'তিন' বুঝায়। এক চন্দ্র, দুই পক্ষ, তিন নেত্র, চারি বেদ ইত্যাদি।

আয়োজন করেন সুতরাং একটু রাত্রি হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অনেকে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধনবান্ ব্যাকুল হইয়া নিমন্ত্রিত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, "মহাশয়, আমার সমুদয়ই প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি যদি কোন প্রকারে অর্দ্ধঘণ্টা কাল ভদ্রলোক-দিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বাবু দীনবন্ধুমিত্রকে বলিলেন, "দীনবন্ধু, আমি একটা করিয়া গল্প করিব, আর তুমিও আমার সহিত পাল্লা দিবে।" এইরূপ বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ও দীনবন্ধু মিত্র নিম্নলিখিতবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প আরম্ভ করিলেন।

"একদিন একটী লোক তাহার বন্ধুর নিকট বলিল, ভাই, আমার অন্যমনস্কতায় বড় ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা হইয়া পড়িয়াছে। সেদিন অন্যমনস্কতা হেতু একখানি হাজার টাকার নোট সামান্য কাগজ মনে করিয়া, তাহা ছিঁড়িয়া কাণ চুলকাইতেছিলাম। ভাগ্যে আমার স্ত্রী দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই ধরা পড়িল, অন্যথা হাজারখানি টাকা লোকসান হইত। বন্ধু তাঁহার বাক্যে বলিলেন, 'আর ভাই, অন্যমনস্কতার কথা কহিও না। অন্যমনস্কতার জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি।' সেদিন রাত্রিতে এক গাছি যষ্টি লইয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ঘরে ফিরিয়া এমন অন্যমনস্ক যে আহারাদি না করিয়া একেবারে শয়ন গৃহে শয্যায় শয়নার্থ উপস্থিত হইলাম। তখন এমন অন্যমনস্ক যে, কোথায় লাঠিগাছটী ঘরের কোণে রাখিয়া আমি শয্যায় শয়ন করিব, তাহা না করিয়া লাঠিটীকে শয্যায় শুয়াইয়া আমি নিজে ঘরের কোণে সমস্ত রাত্রি দণ্ডায়মান থাকিলাম। ভোরের বেলায় আমার স্ত্রী আমাকে কোণে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমাকে শয্যায় শয়ান করাইলেন ও শয্যা হইতে লাঠিটী সরাইয়া কোণে রাখিয়া দিলেন। ভাগ্যে আমার স্ত্রী জানিতে পারিয়া-ছিলেন তাই, কিয়ৎক্ষণও নিদ্রা যাইতে পারিয়াছি, অন্যথা সমস্ত রাত্রি আমাকে অন্যমনস্ক হইয়া অনিদ্রায় কোণে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ বাক্যে ধনবানের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। ইহার পরেই দীনবন্ধু মিত্র নিম্ন-লিখিতবৎ অপর একটী গল্প আরম্ভ করিলেন।

"এক বাটীতে শ্বশ্রূ ও বধূ বাস করিত। এক দিন এক বৈষ্ণব ভিক্ষার্থ সেই বাটীতে উপস্থিত হয়। তৎকালে শ্বশ্রূ ঘাটে বাসন মাজিতেছিল, বধূ ঘরগোবর দিতেছিল। বৈষ্ণব ভিক্ষা চাওয়াতে, বধূ বলিল, 'বৈষ্ণব ঠাকুর, আমার হাত যোড়া, এক্ষণে ভিক্ষা দিতে পারিব না। আপনি অন্যত্র গমন করুন।' বৈষ্ণব এই বাক্যে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে, শ্বশ্রূ শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঘাট হইতে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বৈষ্ণব ঠাকুর, আপনাকে বৌ কি বলিল?' বৈষ্ণব বলিল, বলিল, 'হাত যোড়া, ভিক্ষা দিবার যো নাই, অন্যত্র গমন করুন।'

শ্বশ্রূ এই বাক্যে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া "কি? এত বড় আস্পর্দ্ধা, সে আপনাকে অন্যত্র যাইতে বলে? আসুন ত আমার সঙ্গে কেমন বৌ একবার দেখিব?" এই বলিয়া বৈষ্ণবকে সঙ্গে লইয়া বধূর নিকট চলিল। বৈষ্ণবের মুখ প্রফুল্ল হইল, ভাবিল শ্বশ্রূ ক্রোধে অধিক পরিমাণে ভিক্ষা দিবে। শ্বশ্রূ বধূর নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে বলিতে লাগিল, 'হাঁরে হতভাগি, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, তুই বৈষ্ণব ঠাকুরকে বলিস্ 'আমার হাত যোড়া, অন্যত্র যাও।' তুই কি বাড়ীর কর্ত্রী? তোর মুখে এত বড় কথা? এই দেখ বৈষ্ণব ঠাকুর, এ বাড়ী আমার, আমিই এই বাড়ীর কর্ত্রী। বৌয়ের কথা কথাই নয়, আমি যা বলিব তাহাই ঠিক। আমি আপনাকে বলিতেছি, হাত যোড়া, অন্যত্র যান।" এইরূপ গল্পে নিমন্ত্রিত সমস্ত ব্যক্তির হাস্যে গৃহ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাহারও আর নড়িবার সামর্থ্য রহিল না।

এদিকে ধনবান্ পাতা প্রস্তুত করিয়া সকলকেই আহারার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার আহ্বানে কাণ দিবে কে? কেবল

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও দীনবন্ধু মিত্র কি কথা বলেন তাহা শুনিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। ধনবান্ সরস্বতীর ক্ষমতার নিকট হার মানিয়া করযোড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, সমুদয় অন্ন ব্যঞ্জন জুড়াইয়া যাইতেছে, কেহই আমার কথায় কাণ দিতেছেন না। আপনি আমাকে প্রথম বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শেষে নূতন বিপদে ফেলিতেছেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া কথা বন্ধ করিলেন ও সকলের সহিত হাসিতে হাসিতে আহার করিতে যাইলেন।

৬। একদিন এক ব্রাহ্মণ দূরস্থ দেবপ্রতিমার উদ্দেশে একখানি নৈবেদ্য ও পুষ্প চন্দন লইয়া যাইতেছেন, পথিমধ্যে এক মেথর তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ফেলে। ব্রাহ্মণ দেবতাস্থানে উপস্থিত হইয়া নৈবেদ্য ও পুষ্প চন্দন প্রতিমাসন্নিধানে রাখিয়া নিজে স্নান করিলেন ও সেই নৈবেদ্য ও পুষ্পচন্দন দ্বারা প্রতিমাপূজা করিলেন। ব্রাহ্মণের এই আচরণে সমস্ত লোক তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই বার্ত্তা অল্পকালের মধ্যেই দেশব্যাপ্ত হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাণে উঠিল। রাজা ব্রাহ্মণকে নিষ্ঠাবান্ বলিয়া জানিতেন, সুতরাং তথ্য জানিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মন্, আপনি নাকি মেথরের স্পৃষ্ট পুষ্পচন্দন নৈবেদ্য দ্বারা দেবতা পূজা সমাপন করিয়াছেন? এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না, তাই জানিবার জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়াছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহারাজ, ইহা সত্য কথা। মেথর আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু নৈবেদ্যাদি স্পর্শ করে নাই। সেই জন্য আমি স্নান করিয়াছিলাম, কিন্তু নৈবেদ্যাদি মেথরস্পৃষ্ট না হওয়াতে তাহা কেন ত্যাগ করিব, বা ধৌত করিয়া লইব?

রাজা বলিলেন, "সেকি ঠাকুর! আপনাকে মেথর স্পর্শ করাতে আপনার নৈবেদ্যাদি কি নির্দ্দোষ থাকিতে পারে? আপনি যখন

অপবিত্র হইলেন তখন আপনার স্পৃষ্ট নৈবেদ্যাদিও ত অপবিত্র হইয়া গেল।”

রাজার এই বাক্য সমর্থন করিয়া উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে হেয় বাক্যে নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, “মহারাজ, উনি যে প্রতিমা উক্ত নৈবেদ্যাদি দিয়া পূজা করিয়াছেন তাহার পুনরভিষেকার্থ আদেশ করুন ও তাহার সমস্ত ব্যয় ব্রাহ্মণকে দিতে হুকুম করুন।”

রাজা ব্রাহ্মণের প্রতি তাহাদের মতানুরূপ আদেশ দিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ, আপনি ত ঘোড়ায় চড়িয়া অনেক স্থানে গমন করেন, আপনি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া যান তখন যদি আপনার ঘোটক বিষ্ঠা স্পর্শ করে, আপনি আপনাকে অপবিত্র ভাবিয়া কি গঙ্গাস্নান করেন ?

রাজা বলিলেন, “ঘোটক বিষ্ঠা স্পর্শ করিলে তদারূঢ় ব্যক্তিকে স্নান করিতে হইবে কেন ?” ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহারাজ, আমি যদি মেথর, এমন কি বিষ্ঠা স্পর্শও করি, মদারূঢ় নৈবেদ্য পুষ্প চন্দন কেন স্নান করিবে ? আমি নৈবেদ্যাদির বাহক ঘোটক মাত্র। আপনার মতেই ত তাহাদের অপবিত্র হইবার কথা নহে।

রাজা ও সভাশুদ্ধ সমস্ত লোক এই বাক্যে নিরুত্তর। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, মহারাজ, আমাদের কতকগুলি ধারণা আছে সেই ধারণানুসারেই আমরা সকল সময়ে বিচার করিয়া থাকি। নিহিত সত্য অনুসন্ধান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে যাওয়া বড়ই কঠিন।

উদারতা।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারক স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় বাস করেন। তাঁহার প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন ও তাঁহাকে আপনাদের ঘরের লোক বিবেচনা করেন।

একদিন কোনও পূজা উপলক্ষে এক প্রতিবেশিনী পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া তাঁহার পুরোহিতের অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন। পাড়ার সকলের বাটীতেই পূজা শেষ হইয়া আসিল, বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করাতে কেবল তাঁহার বাটীতেই পূজা বাকী রহিল। ক্রমে পূজার সময় অতিক্রান্ত হইতে চলিল, বৃদ্ধা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শেষে যখন জানিতে পারিলেন, পুরোহিত বিপন্ন হওয়াতে পূজা করিতে আসিতে পারিবেন না, তখন বৃদ্ধা একেবারে কাতর হইয়া ব্রাহ্মণের অন্বেষণে বাহির হইলেন কিন্তু কাহাকেও পাইলেন না, সকলেই জলগ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রতিবেশিনী অনন্যগতিক হইয়া চারিদিকে ব্রাহ্মণের অন্বেষণে ছট্ ফট্ করিয়া বেড়াইলেন, শেষে অগতির গতি স্যার্ গুরুদাসের বাটীতে তাঁহার মাতার নিকট কাঁদিয়া পড়িলেন। "মা, আমাদের বাটী ছাড়া আর সকল বাটীতেই পূজা হইয়া গেল, কেবল এই হতভাগ্যার বাটীতে ঠাকুরের মাথায় ফুল পড়িল না। মা, আমার মত পাপীয়সী জগতে আর নাই। তাহা না হইলে আমার পুরোহিত বিপন্ন হইবেন কেন? মা, এক্ষণে আমি আপনার শরণাগত, আমার একটা উপায় করিয়া দিন, সত্য সত্যই কি আমার গৃহদেবতা অমনি থাকিবেন? তাঁহার পূজা হইবে না?"

স্যার্ গুরুদাসের জননী প্রতিবেশিনীর ক্রন্দনে দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন,

স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

"বাছা তোমার কোনও ভাবনা নাই। যদি অন্য ব্রাহ্মণ না মিলে আমার ছেলে এখনও জল খায় নাই। সেই গিয়া পূজা করিয়া আসিবে। মা, তুমি আর কাঁদিও না।"

প্রতিবেশিনী আশ্বস্তা হইলেন। স্যার্ গুরুদাসের জননী যখন দেখিলেন, অন্য ব্রাহ্মণ মিলিল না, তখন স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা গুরুদাস, তুমি এই দরিদ্র প্রতিবেশিনীর গৃহে যাইয়া পূজা করিয়া আইস। অন্য ব্রাহ্মণ আর মিলিতেছে না।"

স্যার্ গুরুদাস মাতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র প্রতিবেশিনীর সহিত তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন ও যথাবিধি পূজা করিয়া যখন নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, দেখিলেন প্রতিবেশিনী পূজার নৈবেদ্য খানি লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। স্যার্ গুরুদাস প্রতিবেশিনীর হস্ত হইতে নৈবেদ্য খানি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বলিলেন, আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না, আমিই স্বয়ং নৈবেদ্য খানি লইয়া যাইতেছি। আপনি খিন্নদেহে এভার বহন করিতে পারিবেন না। আপনি এক কাজ করুন্, আমার গামছায় নৈবেদ্যের সমস্ত দ্রব্য বাঁধিয়া দিন, তাহা হইলে আপনাকে থালা খানি আনিবার জন্য আর আমার বাটীতে যাইতে হইবে না। প্রতিবেশিনী হাইকোর্টের বিচারকের হস্তে কি করিয়া নৈবেদ্য বাঁধিয়া দিবেন? কাজেই স্যার্ গুরুদাস নিজেই নিজের গামছায় নৈবেদ্য খানি বাঁধিলেন ও তাহা হাতে করিয়া সমস্ত পথ বহিয়া নিজগৃহে মায়ের নিকট তদবস্থায় উপস্থিত হইলেন। মা যখন পুত্রকে নৈবেদ্য বহন করিয়া উপস্থিত দেখিলেন তখন আনন্দে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি পুত্রের সেই মনোরম মূর্ত্তির দিকে নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। যাঁহার আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি অশেষ বৈধব্য ক্লেশ ও দারিদ্র্য দুঃখ বহন করিতে পারিয়াছিলেন সেই পুত্ররত্ন আজি সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারকের অভিমান ত্যাগ করিয়া একটী

অনাথা প্রতিবেশিনীর প্রদত্ত সামগ্রী বহন করিয়া আনিতে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জা বোধ করিলেন না। ভগবান্ তাঁহাকে যে বঙ্গের একটী উজ্জ্বলতম রত্ন করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া জননী আনন্দাশ্রুতে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মনে মনে বলিতে লাগিলেন। আমি ধন্য, যে, আমি গুরুদাস রত্নকে জঠরে ধরিতে পারিয়াছি! মা জগদম্বা, তুমি আমাকে এক পুত্র দিয়াই আমাকে পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ অনুভব করিতে দিয়াছ!!

২। কলিকাতা শিমুলিয়া নিবাসী জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি অতিশয় ভগবদ্ভক্ত ও করুণার্দ্রচিত্ত ছিলেন। লোকের বিপদাপদে বুক দিয়া পড়িতেন, সেই জন্য খৃষ্টানগণ তাঁহাকে যেমন আদর করিতেন, হিন্দুগণও তেমনি শ্রদ্ধা করিতেন। বিপন্নব্যক্তি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক, না, তিনি নির্ব্বিশেষে সাহায্য দান করিতেন। বিপদুদ্ধরণ, ক্ষুধাতুরের ক্ষুন্নিবৃত্তি, রুগ্ন ব্যক্তির রোগোপশম করিতে পারিলেই তিনি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন।

পিতার মৃত্যুর পর দায়াদগণ বিষয় বিভাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, "জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র খৃষ্টান, তিনি চুল চিরিয়া বিষয় ভাগ করিবেন, সুতরাং আদালতের আশ্রয় ব্যতীত সহজে বিভাগ হইবে না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া দায়াদগণ আদালতের আশ্রয় লইয়া কৌসুঁলী নিযুক্ত করিলেন। জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র অকারণ ব্যয় দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা আদালতের আশ্রয় লইয়া বৃথা ব্যয় করিতে বসিলেন কেন?" তাঁহারা বলিলেন "নিজেরা বিষয় সম্পত্তি বিভাগ করিতে যাইলে বিবাদ বিসংবাদ হইবার সম্ভাবনা। কারণ একটা ভাল জিনিসে দুই জনেরই আসক্তি থাকিলে উভয়েই তাহা আত্মসাৎ করিবার জন্য বিবাদ করিবে, কিন্তু আদালত যাহা দিবেন তাহার অন্যথাচরণ করিতে কাহারও সাধ্য হইবে না।"

জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা, আপনাদের যাহার যাহা মনোমত তাহা বাছিয়া লইয়া বিভাগ করুন। দেখা যাউক তাহাতে বিবাদ দাঁড়ায় কি না ?"

জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্রের এই বাক্যে তাঁহারা পরিহাসচ্ছলে আপনাদের মনোমত ভাগ করিতে লাগিলেন। বিভাগান্তে দেখা গেল এরূপ বিভাগ হইলে জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্রের লক্ষ টাকার বিষয় কম হয়। জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র আনন্দিত মনে বলিলেন, "আপনারা এইরূপ ভাগই করিয়া লউন, আমি লক্ষ টাকা ছাড়িয়া দিলাম।" দায়াদগণ এই বাক্যে চমকিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "লক্ষ টাকা ছাড়িয়া দিলে তোমার রহিল কি ? তুমি এরূপ বিভাগে অনুমতি দিলে ভবিষ্যতে তোমার পুত্রগণ তোমাকে কি বলিবে ?" জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বলিলেন, "এদিকে যেমন লক্ষ টাকা কম হইল, অন্য দিকে তেমনি হয়ত লক্ষটাকা বাঁচিয়া গেল। কারণ মকর্দ্দমায় আসক্ত হইয়া কাহার না সর্ব্বনাশ হইয়াছে ? মকর্দ্দমায় সমস্ত ঐশ্বর্য্য যাওয়া অপেক্ষা না হয় লক্ষ টাকা মাত্র গেল! বাকী ত নিরাপদে ভোগ করিতে পারিব ?"

বস্তুতঃ অনেক সময়ে যে জিনিসটী পাইবার জন্য লোকে মকর্দ্দমা করে, সেই জিনিসে তাহার মূল্যের শতগুণ অর্থ ব্যয় হইয়া যায় তথাপি মকর্দ্দমা মিটেনা। ডায়মণ্ড হারবারের লাইনে যাইতে কলিকাতার নিকট যে কয়েকটী পুল আছে, তাহার একতমের নিকট এক কাঠা জমির জন্য দুই জমিদারের বিবাদ হয়। সেই বিবাদে উভয় পক্ষের প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় হয়। দশ টাকার জমির জন্য বৃথা ব্যয় দেখিয়া হাইকোর্টের জজ্ মহোদয় মহা বিরক্ত হইলেন ও সেই জমিটুকু উভয়কে এই বলিয়া সমভাগে বিভাগ করিয়া দিলেন, যে "ইহা একটী অভূতপূর্ব্ব অপব্যয়। মকর্দ্দমার ছল করিয়া এরূপ অপব্যয় করিবার প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাপ।"

জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্রের মুখে উদার বাক্য শুনিয়া দায়াদগণ একেবারে

চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মুখে আর বাক্য সরিল না। তাঁহারা কেবল নির্নিমেষ লোচনে জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "মনুষ্যের উদারতার ন্যায় গুণ আর দ্বিতীয় নাই। ইহা মানুষকে নিম্নস্থান হইতে এত ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয় যে, তাহাকে আর মানুষ বলিতে ইচ্ছা হয় না। যেখানে উদারতা সেই খানেই স্বার্থত্যাগ, সেই খানেই দেবভাব। অতএব এখন হইতে জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্রকে আর মানুষ বলিব না।"

কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত।

১। রামনারায়ণ তর্করত্ন কৈশোরাবস্থায় যশোহরে এক মাননীয় অধ্যাপকের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। তৎকালে সেই স্থানে রাঢ়ী-শ্রেণীর কুলীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহ কুপ্রথা বিশেষ বদ্ধমূল ছিল। অধ্যাপক মহাশয়ের এক প্রতিবেশীর একটী রূপগুণবতী কন্যা ছিল। পিতা কুলপ্রথানুসারে সেই কন্যাকে এক বহুবিবাহকারী কুলীনের হস্তে সম্প্রদান করেন। কন্যার নাম কামিনীদেবী। বিবাহের পর অন্যান্য কুলীন কন্যাদিগের যে দুর্দ্দশা ঘটে কামিনীদেবীর তাহাই ঘটিল। বিবাহের পর চারি পাঁচ বৎসর বালিকা স্বামীর মুখ দেখিতে পাইল না। কামিনীদেবী পতিদর্শনার্থ ব্যাকুল হইল, কিন্তু কি করিবে, মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া সংসারের কাজে অন্যমনস্ক থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কামিনীদেবীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল, এক দিন পতিকে গৃহে উপস্থিত দেখিল। কামিনীর মনে কতই আশা, কতই ভরসা। "আজ আমি স্বামীর চরণ ধরিয়া বলিব, আর্য্যপুত্র, তুমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আমাকে সঙ্গিনী করিয়া লইয়া না যাইলে আমি আত্মহত্যা করিব! ললনাদিগের স্বামীঘর করিবার যে প্রধান সাধ তাহা পূরাইতেই হইবে। শাস্ত্রানুসারে

আমিই তোমার চিরসঙ্গিনী দাসী, আমাকে ছাড়িয়া থাকিলে তোমার সেবা কে করিবে ? তুমি যখন সংসারের কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে উপস্থিত হইবে তখন তোমার চরণ ধৌত করিয়া ব্যজন দ্বারা শ্রান্তিদূর করিতে আমি যেমন পারিব তেমন আর কেহই পারিবে না। যে ভক্ষ্যদ্রব্য খাইতে তোমার অভিরুচি হইবে তাহা পাক করিয়া আমি যেরূপ যত্নের সহিত ভোজন করাইব সেরূপ আর কে করিবে ?" ইত্যাদি নানা চিন্তায় কামিনীদেবী দিন কাটাইল এবং রাত্রিতে শয়ন গৃহে শয্যায় শয়ন করিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে শয়নগৃহে স্বামী উপস্থিত হইয়া দেখে, পত্নী শয্যায় শয়ানা। তাহাকে তদবস্থায় দেখিবামাত্র স্বামী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং এক পদাঘাতে তাহাকে শয্যাচ্যুত করিয়া নিম্নে ফেলিয়া দিয়া কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি ? আমাকে অর্ঘ দ্বারা পূজা না করিয়া ধ্যান করিয়া শয়ন করিয়া আছিস্ ? আমি কত বড় কুলীনের ছেলে তাহা বুঝি মনে নাই ? আমার মান্যের টাকা কৈ ? আগে টাকা বাহির কর্, পরে নিদ্রা যাস্ !"

স্বামীর এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবহারে কামিনীদেবীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। সে একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "আর্য্যপুত্র, তুমি আমাকে টাকা না দিলে আমি টাকা কোথায় পাইব ?" এই কথা বলিতে বলিতে শোকে কামিনীদেবীর ওষ্ঠদ্বয় স্ফুরিত হইতে লাগিল, চক্ষু দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার মুখে আর কথা সরিল না। স্বামীর উপর তাহার এত যে আশা ভরসা সমুদয় অস্তমিত হইল।

স্বামী পত্নীর মুখে এই শেষ বাক্য শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং "আমার যেখানে পূজা নাই সেখানে একবিন্দু সময়ও থাকিতে নাই" বলিয়া সক্রোধে বহির্গত হইয়া, যে চতুষ্পাঠী-গৃহে রামনারায়ণ তর্করত্ন শয়ন করিয়াছিলেন তথায় শয়নার্থ গমন করিল।

কুলীন বিবাহ-ব্যবসায়ীদিগের ব্যবহার জানিতে তর্করত্ন মহাশয়ের কিছুই বাকী ছিল না। তিনি তাহাকে আশ্রয় না দিয়া হাঁকাইয়া দিলেন, কামিনীদেবী জীবনে হতাশ হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিল।

তর্করত্ন মহাশয় কামিনীদেবীকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় বড়ই ভাল বাসিতেন, তাহার পাঠে সাহায্য করিতেন, তাহার নিকট দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রীর পতিপরায়ণতা সম্বন্ধে ইতিহাস বর্ণন করিতেন। সুতরাং কামিনীদেবীর আত্মবিসর্জ্জনে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি কুলীনকুলসর্ব্বস্ব-নামক নাটক লিখিয়া কুলীনদিগের এই কুপ্রথায় প্রথম কুঠারাঘাত করিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের তেমন অর্থ ছিল না যে, এই কুপ্রথা তাড়াইতে অর্থ ব্যয় করিবেন। তিনি 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' লিখিয়াই মনের খেদ কতকটা মিটাইলেন।

২। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের মাতা, কুলীনদিগের বহুবিবাহরূপ কু-প্রথাতে কাতর হইয়া একদিন পুত্রকে বলিলেন, হাঁরে ঈশ্বর, তোদের শাস্ত্রে কি এমন কিছু নাই যাহাতে এই দুষ্প্রথা নিবারিত হইতে পারে? বিদ্যাসাগর বলিলেন, "আছে বৈকি মা, আমি শাস্ত্রীয় বচন তুলিয়া এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব।" এই বাক্যে আনন্দিত হইয়া মাতা, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবচন ও ধন এই উভয় উপায় দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণার্থ যত্নশীল হইলেন। শাস্ত্রবচনের উদ্ধরণার্থ পণ্ডিত-গণ তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। ভগবান্ অর্থ সাহায্য করিবার জন্য ধন ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বার্ষিক আয় ৭০।৭৫ হাজার টাকা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই দ্বিবিধ সাহায্যে কুলীনদিগের কুপ্রথার মূলে ভয়ঙ্কর আঘাত করিলেন।

৩। ইংরাজিশিক্ষাও এই কুপ্রথার মূলে পুনঃ পুনঃ দৃঢ় আঘাত করিতে লাগিল বটে কিন্তু যাঁহার ভীষণ আঘাতে এই কুপ্রথা খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া পড়িল, তিনি নিজে একজন কুলীন। ইহাঁর নাম

বিজয়গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। নিবাস ইথড়া। একেবারে জগন্মাতা কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিবার মানসে প্রিয়পুত্র একজন কুলীন সন্তানকে দাঁড় করাইলেন এবং যাহাতে এই কুপ্রথা দেশ হইতে নিষ্কাশিত হয় তাহার জন্য বিজয়গোবিন্দকে নানা সাহায্য করিতে লাগিলেন।

মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী যে দ্বিবিধ বলে পরিপুষ্ট। প্রথম চরিত্রবল, দ্বিতীয় ধনবল। চরিত্রবলে যত শীঘ্র জয়লাভ করা যায়, ধনবলে তেমন হয় না। কিন্তু ধনবল চরিত্রবলের সহিত মিলিত হইলে অসাধ্য সাধন করে। জগন্মাতা বিজয়গোবিন্দের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই উভয় বলে বলীয়ান্ করিলেন।

বিজয়গোবিন্দ একজন মহাকুলীন। ইহাঁর পিতা বিবাহ-ব্যবসায়ী ছিলেন। বিজয়গোবিন্দ মনে করিলেই বিবাহ-ব্যবসায় করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি এই পাশবিক প্রথাকে শৈশব কাল হইতেই ঘৃণা করিতেন। তিনিও অন্যান্য কুলীন সন্তানের ন্যায় পিতার দয়া মায়া স্নেহ মমতা কখনই দেখিতে পান নাই। মাতামহের গৃহেই পালিত হইয়া মাতার কষ্টই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কখনই তাঁহাকে সুখে দিনপাত করিতে দেখেন নাই। এই সকল কারণেই তিনি কুলীনদিগের কুপ্রথায় বিদ্বেষপরায়ণ হন। কিন্তু এই কুপ্রথা তাড়াইতে হইলে ক্ষমতা চাই। ক্ষমতা কিসে হয়?

তিনি ভগবৎকৃপায় বুঝিয়াছিলেন যে, চরিত্র গঠন করিতে পারিলে মানুষ দেবতা হয়। দেবতার ক্ষমতা অগাধ। তিনি চরিত্র গঠনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মানুষসহজ সমুদায় দোষ দূরীভূত করিলেন। প্রথম স্বার্থপরতা ত্যাগ করিলেন। লোকের সামান্য সুবিধার জন্য নিজের বহু অসুবিধা গণনাস্থলেই আনিতেন না। নিজে জ্বরে আক্রান্ত হইলে, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া জ্বরাক্রান্তের শুশ্রূষা করিতে বসিতেন। স্বার্থপরতার তিরোধানের সহিত তাঁহার নিরভিমানিতা দূরে পলায়ন করিল। একটী বৃদ্ধ কৃষক

এক প্রকাণ্ড বাঁশ ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই সে বাঁশের ভারে ভূমিতে পতনোন্মুখ হইতেছে, দেখিয়া সেই বাঁশটী নিজের ঘাড়ে চাপান সম্পূর্ণ নিরভিমানিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। এইরূপ নিরভিমানিতার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিপন্নের বিপদুদ্ধারার্থ সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। সুতরাং বিজয়গোবিন্দ বাল্যকালেই লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া ক্ষমতাপন্ন হইতে লাগিলেন।

দোষ বিতাড়নের সহিত গুণশিক্ষা করিতে করিতে তিনি একটা সত্য উপলব্ধি করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, গুণলাভের সঙ্গে অহমিকা লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করে। যেখানে অহমিকা সেই খানেই নরক। এই নরক হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তিনি ঈশ্বরের শরণাগত হইলেন। মনুষ্য কিছুই করিতে পারে না। সে যাহা সম্পন্ন করে, সে যাহা লাভ করে, সমস্তই ঈশ্বরের অনুকম্পাতেই হয়, অন্যথা সহস্র চেষ্টা কোথায় ভাসিয়া যায়।" এই ধারণা তাঁহার মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি সকল কাজেই ঈশ্বরের দয়া প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, এবং আত্ম অভিমান সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া ভগবদ্ভক্ত সাধুদিগের প্রকৃতি লাভ করিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়েই ভগবানের নাম, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার উৎসব করিয়া জীবনে পরম সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। সংসারে কাহারও পীড়া হইলে তাহার আরোগ্যের জন্য কর্ত্তব্য বলিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিতেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভরতা ছিল জগন্মাতার উপর। তাঁহার জীবিত কালে দুইটী পুত্র ও কন্যা জীবনলীলা শেষ করেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ শোক করিতে দৃষ্ট হইত না। "যিনি জগতের মা, তিনি যখন আমার পুত্র কন্যা লইয়াছেন তখন এবিষয়ে আমার কথা কহিবার অধিকার নাই। তিনি যখন আমার চেয়ে ঢের ভাল বুঝেন, তখন এবিষয়ে আমার ক্ষোভ প্রকাশ করা ধৃষ্টতামাত্র।" এইরূপে যখন বিজয়গোবিন্দের চরিত্র সম্পূর্ণ গঠিত হইল ও তাহার সহিত ভগবদ্ভক্তি

মিশ্রিত হইয়া সোণায় সোহাগা হইল, সুতরাং দেবভাব বিকাশ হওয়াতে লোকে তাঁহাকে দেবতার মত মনে করিতে লাগিল, তখন জগদম্বা তাঁহাকে আর একটী বল আনিয়া দিলেন। ইহা ধনবল।

বিজয়গোবিন্দের শৈশবাবস্থায় তাঁহার মাতামহ তাঁহার মাতাকে দশ বিঘা জমি দানপত্র করিয়া দিয়াছিলেন। সেই দশ বিঘা জমির উপস্বত্বের উপর নির্ভর করিয়া বিজয়গোবিন্দ দুই ভগিনী ও মাতার ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন।

বিজয়গোবিন্দের মাতুল একুইটেবল কোল্ কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্ক ভাগিনেয়কে অতীব মেধাবী ও দেববৎ চরিত্রবান্ দেখিয়া কোম্পানীর বড় বাবুর সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। ভগবৎপ্রসাদে বিজয়গোবিন্দ বড় বাবুর সুনয়নে পড়িলেন ও ৮৲ টাকা বেতনের এক চাকরী পাইলেন। এই আট টাকা ও দশ বিঘা জমির উপস্বত্বে বিজয়গোবিন্দের সংসার চলিতে লাগিল।

বিজয়গোবিন্দের অসামান্য গুণবিকাশে ও তাঁহার ভগবদ্ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া বড় বাবু তাঁহাকে কয়লা সম্বন্ধে নানা শিক্ষা দিতে লাগিলেন ও শেষে এমন দক্ষ করিয়া তুলিলেন যে বিজয়গোবিন্দ কয়লার জমি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে নিজেই ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এই ব্যবসায়ে ভগবৎকৃপায় এত অর্থাগম হইতে লাগিল, যে বিজয়গোবিন্দ বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন।

যখন বিজয়গোবিন্দের চরিত্রবল ও ধনবল উভয়ই পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইল, তখন তিনি কুলীনদিগের দুষ্প্রথার মূলে এমন অস্ত্রাঘাত করিলেন যে কৌলীন্যপ্রথা টলমল করিতে লাগিল। বহুবিবাহপ্রথা কেবল যে তাঁহার গ্রাম হইতে পলায়ন করিল তাহা নহে, তাঁহার চরিত্রের প্রভাব আত্মীয় কুটুম্বদিগের চিত্তে বিরূঢ় এই দুষ্প্রথার অঙ্কুর একেবারে নির্ম্মূল করিল। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই দুষ্প্রথা নির্ম্মূল হইবে ভাবিয়া বিজয়-

গোবিন্দ গ্রামে একটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন ও তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন ও যাহাতে অধর্ম্মভাব বিদূরিত হইয়া ধর্ম্মভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহার নানা উপায় করিলেন।

বিজয়গোবিন্দ ভগবানের আশ্রয়ে নানা সদনুষ্ঠান করিয়া শেষে ৭৬ বৎসর বয়সে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে জ্বররোগে আক্রান্ত দেখিয়া তাঁহার পত্নী যথন বুঝিলেন, এবারে আর নিস্তার নাই তথন তিনি স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বাসন্তীমন্দিরে পড়িয়া জগন্মাতার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, "মা লজ্জানিবারিণি, তুমি আমার লজ্জা নিবারণ কর। আমাকে বিধবা এই অপযশ হইতে রক্ষা কর। আমি চিরকাল তোমার কোলে আশ্রয় পাইয়া এক্ষণে যেন নিরাশ্রয় না হই। পতির মরণের পূর্ব্বেই যেন আমার মৃত্যু হয়। আমি তোমার শরণ লইলাম।"

বিজয়গোবিন্দের সাধ্বী পত্নী যেরূপ ব্যগ্রতা ও কাতরতার সহিত প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে জগন্মাতা তাঁহার বাক্যে কাণ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। সাধ্বী পত্নী সেই রাত্রিতেই জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন ও পর দিন ভক্তিভরে স্বামীর চরণ দেখিতে দেখিতে জীবনলীলা সাঙ্গ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে বিজয়গোবিন্দ পত্নীকে বিদায় দিবার সময় বলিলেন, "গৃহিণি, তুমি মায়ের ঘরে অগ্রে গিয়া অবস্থান কর, আমি দুই এক দিনের মধ্যেই যাইতেছি।" পত্নীর মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে বিজয়গোবিন্দও গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোককে কাঁদাইয়া স্বর্গধামে জগন্মাতার চরণে আশ্রয় লইলেন। পতিপত্নীর শ্রাদ্ধ এক দিবসেই মহাসমারোহে সম্পাদিত হইল।

ধর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালীর মহত্ত্ব।

লোকের মহত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইলে, তাহার ধর্ম্মক্ষেত্রে অনুসন্ধান আবশ্যক। মানুষ কতদূর নিষ্কপট তাহা জানিতে হইলে তাহার ধর্ম্মাচরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারা যায়। ধর্ম্মই মহত্ত্বের সাধক, সুতরাং ধর্ম্মাচরণেই মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাঙ্গালী যে কত বড় মহান্ তাহা হিন্দুদের ধর্ম্মক্ষেত্র ৺কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে ইতস্ততঃ বিচরণ করিলে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

জনশ্রুতি আছে, রাণী ভবানী হইতেই কাশী নগরীর বিশেষ উন্নতি হয়। তিনি ৩৬৫ খানি বাটী প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন একখানি করিয়া বাটী এক এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া তিন শত পৈঁষট্টি ঘর ব্রাহ্মণ স্থাপন করেন। রাণী ভবানী বাঙ্গালী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মনে একান্ত বাসনা হয়, "আমার স্বজাতীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এই সকল বাটীর প্রতিগ্রহ করুন।" কিন্তু তাঁহার মনে আক্ষেপ রহিয়া গেল, কোনও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ একখানি বাটীরও প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলেন না। সমস্ত বাটীই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ দানরূপে গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গালী যতই দরিদ্র হউন, 'তীর্থস্থানে প্রতিগ্রহ লইব না' এই প্রতিজ্ঞা হইতে তিনি একেবারেই অবিচলিত রহিলেন। বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণগণ, তোমাদের ভিতর ত অনেক ব্যক্তিই দারিদ্র্যে প্রপীড়িত ছিলেন, দারিদ্র্যপীড়া কি একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকেও ধর্ম্মের নিষ্কপটতা হইতে হটাইতে পারিল না? ধন্য তোমাদের মনের শক্তি!" অনাহারে থাকিব, সেও ভাল, তথাপি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইব না" এ প্রতিজ্ঞা কয়টা জাতি রক্ষা করিতে পারিয়াছে!! পৃথিবীমধ্যে তোমরা যে সর্ব্বোচ্চজাতীয়, তাহার এই একটী উজ্জ্বলতর প্রমাণ।

৺কাশীধাম যেমন বঙ্গবাসীদিগের গৌরবের পরিচায়ক স্থান,

শ্রীবৃন্দাবনও সেইরূপ। রূপ সনাতন যে স্থানকে বৃন্দাবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই স্থানই বৃন্দাবন নামে তীর্থ স্থান হইয়াছে। ইহার যাঁহা কিছু শ্রী, তাহা বঙ্গবাসীদিগকে লইয়াই হইয়াছে।

৺ কাশীধামে বঙ্গীয়দিগের নানা কীর্ত্তির মধ্যে অন্যতম কীর্ত্তি 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।' বঙ্গীয়গণ কাশীধামে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, ছত্রস্থাপন প্রভৃতি করিয়া কত কীর্ত্তিরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও এই সুদৃশ্য তীর্থটী স্বর্গভূমি করিয়া তুলিয়াছেন; রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দ্বারা ইহা স্বর্গাপেক্ষাও দর্শনীয় হইয়াছে। সেবাশ্রমটী দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। একটী প্রাচীর বেষ্টিত আয়তনের মধ্যে অনেকগুলি সুদৃশ্য বাটী আছে। যে বঙ্গবাসী যে বাটী নির্ম্মাণের সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহার নাম তাহাতে ক্ষোদিত হইয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। প্রত্যেক বাটীর চারি ধারেই সকুসুম পুষ্প বৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। সমুদয় স্থানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গৃহসৌন্দর্য্য, পুষ্প বাটিকার সৌন্দর্য্য বঙ্গবাসীদিগের মনের সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিয়া এক অদ্ভূত দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। যে সকল সেবক নিরাশ্রয় বিপন্নদিগের সেবা করিতেছেন তাঁহাদের দীনভাব, সেবার্থ আগ্রহ, নিঃস্বার্থতা প্রভৃতি মানবের সর্ব্বোচ্চ মনোভাব প্রত্যক্ষ করিলে বাঙ্গালী মাত্রেই আপনার জাতীয়গৌরব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন না। সেবকগণ পথে ঘাটে পতিত মুমুর্ষুগণকে খুঁজিয়া আনিয়া যে ভাবে সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন, যে যত্নে ঔষধ পথ্য দিয়া তাঁহাদিগকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা কারতেছেন, তাহা দেখিলে 'আমিও একজন বাঙ্গালী' বলিয়া মনে কতই আনন্দ উপচিত হয়। এই সমস্ত কার্য্যই ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছে, এবং যাহা কিছু ভিক্ষালব্ধ ধন প্রধানতঃ বঙ্গীয় মহোদয়গণই প্রদান করিতেছেন।

চারুচন্দ্র দাস যিনি এক্ষণে সেবা সমিতির সহকারী সম্পাদক তিনি ১৯০০ খৃঃ অব্দের ১৩ই জুন তারিখে ৺ কাশী ধামে গঙ্গাস্নান করিয়া যখন

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন দেবনাথপুরায় পথের ধারে একটী মুমূর্ষু বৃদ্ধা বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার গতি স্খলিত হইল। তিনি ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? আপনি পথের ধারে পড়িয়া আছেন কেন? আপনার কি কোনও পীড়া হইয়াছে? বৃদ্ধা অতি কষ্টে উত্তর দিলেন, বাবা, আমার চারি দিন আহার মিলে নাই, তাই গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়া আছি। আমাকে দুটা খেতে দেও।" বৃদ্ধার বাক্যে চারুচন্দ্রের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, চক্ষে জল আসিল। তিনি কাতরভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন ও যাহাতে জীবে শিবের সেবা করিতে পারেন তজ্জন্য প্রাণের সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে একটীও পয়সা ছিল না যে, একটি মিষ্টান্ন কিনিয়া বৃদ্ধাকে জল খাওয়াইবেন। তিনি কাতর প্রাণে দেবাধিদেব বিশ্বেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন; বিশ্বেশ্বরের কৃপায় তিনি ভিক্ষা করিয়া চারি আনা পয়সা পাইলেন ও তাহা দ্বারা দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া বৃদ্ধার ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিলেন।

চারুচন্দ্র সন্ধ্যার সময় পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিলেন ও বৃদ্ধাকে দুগ্ধ পান করাইয়া নিকটবর্ত্তী এক গৃহে যাহাতে আশ্রয় পান তাহার ব্যবস্থা করিলেন। সেই রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়াতে শীতের প্রাদুর্ভাব হয়। বৃদ্ধা শীতে কাঁপিতেছেন এই অবস্থায় চারুচন্দ্র তাঁহার সেবার্থ উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার শীত নিবারণের অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া নিজের গাত্র বস্ত্রখানি দিয়া তাঁহার শীত নিবারণ করিলেন। মানুষ যে সেবায় আত্মাকে ভুলিয়া যায়, সেই সেবাই যথার্থ সেবা, ইহার ভিতরে কপটতা ছিল না, স্বার্থপরতা ছিল না, সুতরাং ইহা দেবভাব হওয়াতে যে শুনিতে লাগিল সকলেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। চারুচন্দ্রের অনেক বন্ধু তাঁহার সদনুষ্ঠানে সহায়তা করিতে লাগিলেন, সুতরাং বৃদ্ধা রমণী উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষায় উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইলেন।

চারুচন্দ্রের এই স্বার্গীয় অনুষ্ঠানটী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ভিত্তিস্বরূপ হইল। তিনি ও তাঁহার বন্ধুগণ এক্ষণে অসহায় বিপন্নদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ও ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এরূপ সদনুষ্ঠান কতকাল মনুষ্যের অজ্ঞাতাবস্থায় থাকিবে? মৃগনাভি যতই লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা কর না, তাহার গন্ধ দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিবে। চারুচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণের এই স্বর্গীয় উত্থম কলিকাতার এণ্টালি নিবাসী ৺দেবনারায়ণ দেবের পৌত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ দেবের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি নিরাশ্রয়দিগের আশ্রয় দিবার জন্য ভূমিক্রয়ার্থ চারি সহস্র মুদ্রা দান করিলেন। এবং হুগলি জিলায় বাঁশবেড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ পাল এই সদনুষ্ঠানের পোষক হইয়া দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন্।

এইরূপে কয়েকটী দীন দরিদ্র বাঙ্গালীর স্বর্গীয় উদ্যম দুইটী ধনবান্ বাঙ্গালীর উৎসাহ পাইয়া এক্ষণে শাখাপল্লবে এরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে যে ইহার ছায়ায় বসিয়া কত বিপন্ন যে শান্তিলাভ করিতেছে, ও ভবিষ্যতে করিবে, তাহা সম্যক্ রূপে বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। বর্ত্তমান আশ্রয়ে আশ্রিতদিগের সম্বন্ধে বহু ঘটনার মধ্যে একটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ করা গেল।

পাবনা জিলা নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ সূত্রধর ৺কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমন করিতে বাসনা করেন। ইহাঁর নাম বলরাম। বয়স যষ্টি বৎসর। তীর্থ গমনের বাসনা পত্নীকে জানাইলে তিনিও তাহাতে মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইতে আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। "তীর্থস্থানে অনশনাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া অসুস্থ হইলে কে তোমার পরিচর্য্যা করিবে?" বলিয়া পত্নী তাঁহার সহিত যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। পুত্রও পিতা মাতাকে বিদেশে অসহায় অবস্থায়

ছাড়িয়া দিতে পারিবে না বলিয়া সঙ্গে যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। সুতরাং তিন জনেই তীর্থযাত্রা করিয়া প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন ও তথায় কিছুদিন যাপন করিয়া ৺কাশীধামে যাত্রা করিলেন। পথশ্রমে ব্রতাদিপালনে ক্লিষ্ট হওয়াতে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই তিন জনেরই জ্বরাতিসার রোগ দেখা দিল ও ও তিন জনেই রোগের প্রকর্ষে অজ্ঞানাভিভূত হইয়া পড়িল। নিকটে যাহা অর্থ ছিল এক চোর সুবিধা পাইয়া সমুদায় আত্মসাৎ করিয়া উহাদিগকে একেবারে নিরাশ্রয় করিয়া ফেলিল।

এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়া পিতা মাতা ও পুত্র একেবারে জীবনে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের ভরসার মধ্যে কেবল বিশ্বেশ্বর। তাঁহারা অগতির গতি বিশ্বেশ্বরকেই প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। "ভগবন্, তোমার দর্শনার্থ তোমার ক্রোড়েই আসিয়া পড়িয়াছি, বাবা, তুমি নিরাশ্রয় সন্তানদিগকে আশ্রয় দেও" এই বলিয়া অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া প্রাণের সহিত তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দনে বিশ্বেশ্বরের সিংহাসন টলিল। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সেবকগণ বিপন্নদিগের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র সেবকগণ সমুদয় অবগত হইয়া পাল্‌কী করিয়া তাঁহাদিগকে সেবাশ্রমে লইয়া গেলেন ও তাঁহাদিগকে ঔষধ ও পথ্যাদি দিয়া অশেষ প্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের উপর বিশ্বেশ্বরের দয়া পড়িয়াছে তাঁহাদের আর কিসের ভাবনা? অতি অল্প দিনের মধ্যেই পিতা মাতা ও পুত্র আরোগ্য লাভ করিয়া বিশ্বেশ্বরের করুণার জয়ধ্বনি করিতে করিতে ও সেবকগণকে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের হাত।

মানুষ যখন যাহা করিতে মনন করে সকল সময়ে তাহা সুসাধ্য হয় না। প্রতিকূল ঘটনা আসিয়া তাহাকে এমন বিব্রত করিয়া তুলে যে সে হতাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন সেই সকল দুর্ঘটনার মধ্যে ভগবানের হাত দেখিতে পায় তখন সে আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে ও কুন্তীদেবীর ন্যায় এই প্রার্থনা করিতে থাকে, "ভগবন্, বিপদ্ই অহরহঃ দিও। কারণ বিপদের মধ্যে তুমিই বিদ্যমান।"

১। ৺পুরীতে যাইবার জন্য যাত্রিগণ লরেন্স জাহাজে উঠিল, জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ অসংখ্য টিকিট বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইলেন, কিন্তু সকল যাত্রীকে স্থান দিতে পারিলেন না। যাত্রিগণ ছাড়িবে কেন, সকলেই জোর করিয়া জাহাজে উঠিল। অত যাত্রীকে সমুদ্রমধ্য দিয়া লইয়া যাইতে সাহসে কুলাইল না। উহাদের ভরে জাহাজ নিশ্চয়ই জলমগ্ন হইবে ভাবিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অনেকগুলি যাত্রীকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দিবার হুকুম দিলেন। যাহাদিগকে আদেশ করিলেন তাহারা নির্ম্মম হইয়া যাহাকেই ইচ্ছা হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া দিতে লাগিল। ইহাতে জাহাজ মধ্যে বহু স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। কারণ যাহারা নামিতে অস্বীকার করিল তাহাদিগকে প্রহারযন্ত্রণাও সহ্য করিতে হইল। অনেকে প্রহার যাতনায় কাতর হইয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিল। "টাকা দিব আবার মার খাইব? একি বিচার !!" যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা প্রহারে ক্রুদ্ধ হইয়া এই বলিয়া শাসাইতে লাগিল, "আচ্ছা, পুরী হইতে ফিরিয়া আইস, আদালতে দাঁড় করাইয়া ইহার শাস্তি দেওয়াইব।" কেহ কেহ বা জাহাজের ভৃত্যদিগকে কিছু কিছু ঘুস দিয়া অব্যাহতি পাইল।

এইরূপে জাহাজের ভৃত্যগণ যাহাদিগকে গলায় ধাক্কা দিয়া টানিয়া

হেঁচড়াইয়া প্রহার করিয়া স্থলে নামাইয়া দিল তাহারা এই বিপদে ম্রিয়মাণ হইয়া স্থলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। জাহাজ ছাড়িল; জাহাজে যাহারা রহিল তাহারা আপনাদের সৌভাগ্যে মহা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ বা আনন্দে বলিতে লাগিল, "ভাগ্যে আমাদের টাকার সচ্ছলতা ছিল, তাই কিছু কিছু ঘুস্ দিয়া রক্ষা পাইয়াছি। অর্থই আজ আমাদের বিপদে রক্ষা করিল।"

যাহারা স্থলে পড়িয়া হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিল তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এদিকে যেমন লরেন্স জাহাজের কর্তৃপক্ষকে গালি দিতে লাগিল, ওদিকে তেমনি জগন্নাথদেবকে ক্রোধভরে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "ঠাকুর এমন কি মহাপাপ করিয়াছি যে আমাদের কপালে এত নিগ্রহ লিখিয়াছ? অপরাধ, তোমাকে কেবল দর্শন করিব। এই অপরাধে কি আমাদিগকে এত বিপদে ফেলিতে হয়, এত ক্লেশ দিতে হয়? ভক্তগণের প্রতি এত নিদয় কেন হইলে? তুমি কি চাও, ভক্তগণ তোমাকে দর্শন না করুক, স্মরণ না করুক, কেবল সংসারের কীট হইয়া মজিয়া থাকুক! ঠাকুর, তোমাকে আর আমরা ডাকিব না। যে তোমাকে ডাকে তাহার অদৃষ্টে এত নিগ্রহ!!"

লরেন্স্ জাহাজ ক্রমে দৃষ্টিবহির্ভূত হইল। সেই দৃষ্টি বহির্ভূত হওয়া চিরকালের জন্যই হইল। জাহাজখানি কোথায় ডুবিল, কোথায় যাত্রীদের হাহাকার ধ্বনি উঠিল, কেহই বলিতে পারিল না।

এক্ষণে যাহারা নিষ্কাশিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিয়াছিল, তাহারা প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে ভগবানের হাত দেখিতে পাইয়া একেবারে নিস্পন্দ হইয়া পড়িল, ভক্তিভরে চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল, সকলেই গদগদ স্বরে কহিতে লাগিল, ঠাকুর, তোমার বিচিত্র লীলা!! যাহাদিগকে তুমি রক্ষা কর, তাহাদিগকে কখন কখন রক্ষার জন্য প্রহারও যে কর ইহা আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই!!

২। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গোরপে হইতে কলিকাতায় আসিবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন ও টিকিট ক্রয় করিলেন। ট্রেণ পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার এমন এক প্রতিকূল ঘটনা ঘটিল যে তাঁহাকে টিকিট বিক্রয় করিয়া ঘরে ফিরিতে হইল। কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সুতরাং ফিরিতে বহু ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিতে লাগিলেন। কি করিবেন, ঘটনায় বাধ্য হইয়া অতি কষ্টে ফিরিলেন।

শামনগরে সেই ট্রেণখানির সহিত অন্য ট্রেণের সংঘর্ষ হইয়া সেদিন কত লোক যে প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহা মনে হইলে আজিও লোমহর্ষণ হয়। রেলওয়ে এমন বিপদ্ আর কখনও ঘটে নাই।

প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার যখন তাঁহার প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইলেন তখন তিনি একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি ভক্তিভরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্ যে প্রতিকূল ঘটনাকে নিন্দা করিতেছিলাম তাহার মধ্যে যে তুমি বিদ্যমান ছিলে তাহা কি করিয়া বুঝিব ?"

৩। শম্ভুচন্দ্র ও রামেশ্বর দুই ভাই এক সংসারে থাকিয়া সুখে বাস করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র গৃহে থাকিয়া সংসারের কার্য্য দেখিতেন, কনিষ্ঠ রামেশ্বর চাকরী করিয়া বেতন যে দুইশত টাকা পাইতেন সমস্ত দাদার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। সেকালে ২০০৲ দুইশত টাকা হাজার টাকার সমান ছিল। তখন টাকায় দুইমণ তণ্ডুল বিক্রীত হইত। সুতরাং উহাঁদের সংসার রাজার সংসার বলিলেও অত্যুক্তি হইত না।

মহা আনন্দে কিছুদিন কাটিয়া গেল। শম্ভুচন্দ্রের অনেক গুলি পুত্র কন্যা হইল। রামেশ্বর নিঃসন্তান রহিলেন। রামেশ্বরের পত্নী ঈর্ষান্বিত হইয়া সমস্ত খরচ কেবল বড় ভাইয়ের জন্যই হইতেছে বলিয়া স্বামীর মন টলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও শেষে কৃতকার্য্যও হইলেন।

রামেশ্বর একদিন দাদাকে স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন, দাদা, আমি ভিন্ন হইব। দাদা এই নিদারুণ বচনে একেবারে আকাশ পাতাল দেখিলেন, ভাইয়ের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। তাঁহার সমস্ত কথা ভাসিয়া গেল। রামেশ্বর পৃথক্ হইলেন।

সম্পত্তির মধ্যে তিনি ২০ বিঘা জমি পাইলেন। শম্ভুচন্দ্র চক্ষের জল চক্ষে মারিয়া ঐ জমি অবলম্বন করিয়া গাছ পালা ফল মূল উৎপাদন দ্বারা অতি কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিলেন। দেশের জমিদার শম্ভুচন্দ্রের ক্রিয়া কলাপে অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি শম্ভুচন্দ্রের এই দুর্দ্দশা শুনিয়া অল্প খাজনায় আর ২০ বিঘা জমি দিলেন, ও তাঁহার দুই পুত্রকে কলিকাতায় নিজের বাসা বাটীতে রাখিয়া বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। শম্ভুচন্দ্রের পুত্রদ্বয় অতি সামান্য ইংরাজি পড়িয়া ছাপাখানায় ১০৲ টাকা মাহিয়ানায় কর্ম্ম করিতে লাগিল ও সমুদয় টাকাই পিতাকে পাঠাইয়া দিতে লাগিল। সেই টাকার সাহায্যে পিতা চাষের অনেক উন্নতি করিয়া অবশিষ্ট পুত্রদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা একেবারেই ঘুচিয়া গেল।

এদিকে রামেশ্বর যে আপিসে কাজ করিতেন, তাহার দিন দিন অনুন্নতি হওয়াতে মনিব রামেশ্বরের বেতন প্রথমে ১০০৲ টাকা করেন ও শেষে ৫০৲ টাকা করিয়া দেন। একার্য্য ছাড়িয়া অন্য কার্য্য করিতে তাঁহার সাহস হইল না, সুতরাং ঐ আপিসেই ৫০৲ টাকা বেতনেই পড়িয়া রহিলেন। কিছু দিন পরে রামেশ্বরের মৃত্যু হইল। বিধবা পত্নী সঞ্চিত বহুল অর্থ লইয়া ভ্রাতার বাটীতে উপস্থিত হইলেন ও প্রথম প্রথম বহু সমাদর পাইলেন। শেষে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার সমুদয় অর্থ আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে বাটীর বাহির করিয়া দিল। রামেশ্বরের পত্নী এ অবস্থায় কোথায় যাইবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন ও শেষে ভাশুরের বাটীতেই উপস্থিত হইলেন।

শম্ভুচন্দ্র একটী অবগুণ্ঠনবতী বিধবা নারীকে বাটীতে উপস্থিত দেখিয়া একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখ ত কে আসিলেন? পুত্র দেখিল তাহার সেই খুড়ীমা আসিয়াছেন; দেখিয়া পিতার নিকট গিয়া বলিল, বাবা, যে কাকীমা আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়াছিল সেই সর্ব্বনাশী আসিয়াছে। শম্ভুচন্দ্র পুত্রকে গুরুজনের প্রতি অমান্যসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন, বৎস, তোমার খুড়ীমা হইতেই তোমাদের এত উন্নতি হইয়াছে। অতএব তাঁহাকে অমান্য বা অযত্ন করিও না। যাহাতে উঁহার কোনও কষ্ট না হয় সেই দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিও। যাঁহার নির্ম্মমতায় আমাদের এত ভাল হইয়াছে, তাঁহার প্রসন্নতা হইলে আমাদের যে আরও উন্নতি হইবে সে বিষয়ে কখনও সন্দেহ করিও না। আপনার লোক শত্রুতা করিলেও তাহা মিত্রতায় পরিণত হয় এমনি ভগবানের নিয়ম। অতএব যাও, তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর ও যাহাতে তাঁহার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে তজ্জন্য সর্ব্বদাই যত্নপরায়ণ হও। রামচন্দ্র বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া কৈকেয়ীর চরণে প্রণিপাত করিবার সময় প্রভূত ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বিমাতা আমার প্রতি নিষ্করুণ না হইলে আমার এত অমানুষ গুণের বিকাশ হইত না, আমার নাম দশানন-হন্তা হইত না, ভরত ও লক্ষ্মণ সংসারক্ষেত্রে অমর হইত না।

৪। ব্রহ্মচারী যোগেন্দ্রনারায়ণ, যিনি ৺ কাশীধামে খালিস্‌পুরায় পণ্ডিতপ্রবর প্রিয়নাথ তর্করত্নের বাটীতে অবস্থান করিতেন, তিনি একদা রামেশ্বরতীর্থ দর্শনার্থ গমন করেন। তিনি যখন যাত্রা করেন, তখন প্লেগ-রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব। তিনি নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে, পরীক্ষার্থ পুলিস্ আসিয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য যাত্রীকে লইয়া গিয়া পরীক্ষান্তে এক একটা ছাড় লিখিয়া দিতে লাগিল। যোগেন্দ্রনারায়ণ সংকল্প করেন রামেশ্বরের শিবপূজা করিয়া পরে জলগ্রহণ করিব।

সুতরাং ষ্টীমার ঘাটে যাইয়া ষ্টীমার ধরিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমেই ছাড় পাইলেও পথে যাহাদের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের ছাড় হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অধিক বিলম্ব হওয়াতে উঁহারা ষ্টীমারের নিকট যাইতে না যাইতে ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। যোগেন্দ্রনারায়ণ মহাবিপদে পড়িলেন। সঙ্কল্পের অন্যথাচরণ করিতে পারিবেন না বলিয়া ষ্টীমারের পুনরাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। "ষ্টীমার আসিতে বহুবিলম্ব হইবে, পরে শিব-পূজাদি করিতে রাত্রি হইবে, এক্ষণে রৌদ্রের যেরূপ প্রকোপ তাহাতে অনেক যন্ত্রণা পাইতে হইবে, কেনই বা অন্যের জন্য এত কষ্টে পড়িতে গেলাম, উহারা আমার কে? উহাদিগকে ত কোনও কষ্ট পাইতে হইবে না, উহারা স্বেচ্ছামত আহারাদি করিবে, আমি জলতৃষ্ণায় মারা যাইতে বসিয়াছি। হা বিশ্বেশ্বর, আমাকে কেন এত যন্ত্রণা দিতেছ, আমি পিপাসায় মারা যাইলে তোমারই কলঙ্ক হইবে। লোকে বলিবে নিষ্করুণ অভীষ্টদেবের দর্শনার্থ পিপাসায় ও রৌদ্রে প্রাণ হারাইয়াছে।"

এইরূপ নানা ক্ষোভের পর নিকটে একটু সামান্য ছায়া দেখিতে পাইয়া সেই ছায়ায় বসিয়া যোগেন্দ্রনারায়ণ কেবল পিপাসাজনিত কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলেন, ও আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার উল্লেখ করিয়া ধিক্কার দিতে লাগিলেন। যথা সময়ে ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বহু যাত্রী ষ্টীমারে উঠিল, যোগেন্দ্রনারায়ণও তাহাদের সহিত ষ্টীমারে উঠিলেন। ষ্টীমারেও ছায়া মিলিল না। সূর্য্যদেব কিঞ্চিৎ ঢলিয়া পড়াতে পাশ দিয়া এমন রৌদ্র আসিতে লাগিল যে রৌদ্রের তাপে সকলেই প্রপীড়িত হইতে লাগিল। যোগেন্দ্রনারায়ণ ষ্টীমারের সকল স্থান অন্বেষণ করিয়া এক-স্থানে একটু ছায়া দেখিলেন। সে স্থানে একটী ভদ্র লোক বসিয়া আল-বোলায় তামাক খাইতেছিলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ ছায়ালাভের আশায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার নিবাস?'

তিনি উত্তর করিলেন "আমার নিবাস বহুদূরে, সিমলা পাহাড়ের নিকট।" যোগেন্দ্রনারায়ণ রৌদ্রে ও পিপাসায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হওয়াতে ভদ্র ব্যক্তির সহিত অধিক কথা হইল না বটে কিন্তু তাঁহার মনে ধারণা হইল, ইনি কোনও ভাগ্যবান্ সৎপুরুষ হইবেন।

ষ্টীমার ঘাটে গিয়া পৌঁছিল। সকলেই অভীষ্ট স্থানে গমন করিল। যোগেন্দ্রনারায়ণ শিবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া মনের সাধ মিটাইয়া শিবপূজা করিলেন ও মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া জলযোগ করিয়া ক্ষুধা ও পিপাসার শান্তি করিলেন।

তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের দিন ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া যোগেন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন তিনি একেবারে নিঃস্ব হইয়াছেন। "কি সর্ব্বনাশ! এখন কেমন করিয়া স্বদেশে পৌঁছিব? হে ভগবন্ বিপন্নকে আশ্রয় দেও" বলিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, সেই ভদ্রব্যক্তি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনার্থ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহাকে দেখিয়া যোগেন্দ্রনারায়ণ আপনার দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিলেন, তিনি যোগেন্দ্র-নারায়ণকে পাথেয় প্রদান করিয়া এই বিপদে রক্ষা করিলেন।

সকলেই ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণে যাইতে যাইতে পথে যোগেন্দ্রনারায়ণের উদরে একটা যাতনা হইতে লাগিল। এই যাতনা শেষে এমন প্রবল হইয়া উঠিল, যে তিনি অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রব্যক্তি ইহা জানিতে পারিয়া একটা ষ্টেশনে নামিয়া যোগেন্দ্র-নারায়ণকে বলিলেন, "আপনি কটকে নামিয়া হাসপাতালে অবস্থান করুন। আমি কটকে কয়েকদিন থাকিব। সেখানে যাহাতে আপনার সুব্যবস্থা হয় তাহা করিব।"

যথা সময়ে ট্রেণ কটকে থামিল। যোগেন্দ্রনারায়ণকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় তিনি পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। হাসপাতালের চিকিৎসায় তাঁহার রোগের শান্তি হইল না।

ঘটনাচক্রে সে দিন কটক হাসপাতালে কোনও কার্য্য উপলক্ষে অনেকগুলি ডাক্তারের সমাবেশ হয়। একটী বিখ্যাত ডাক্তার যোগেন্দ্র-নারায়ণের চীৎকারে করুণার্দ্র হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা সমস্ত যাতনা অপসারিত করিলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ বাঁচিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ভদ্রলোকটী যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার যাতনার শান্তি হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তারের আদেশ হইয়াছে, আর কয়েক দিন হাসপাতালে থাকিতে হইবে। ইহাতে ভদ্রলোকটী যোগেন্দ্রনারায়ণের হস্তে ৺ কাশী যাইবার ভাড়া ও পাথেয় দিয়া বলিলেন, "আপনি বিশেষ সুস্থ হইয়া পরে ৺ কাশীধামে যাত্রা করিবেন। আপনি যখন যেমন থাকেন আমাকে জানাইবেন। আমার ঠিকানা আপনার কাছে রাখিয়া দিউন।" এই বলিয়া ঠিকানা দিলেন, "বিলাসপুরের রাজা।" যোগেন্দ্রনারায়ণও নির্ব্বাক্।

যোগেন্দ্রনারায়ণ বিলাসপুরের রাজার যত্নে সে যাত্রায় বাঁচিয়া গেলেন দেখিয়া, একেবারে ভক্তিতে গদগদ হইয়া ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর, ভাগ্যে আমি সে দিন সঙ্গীদিগের খাতিরে ষ্টীমার পাই নাই, তাই বিলাসপুরের রাজার সহায়তা লাভ করিয়াছি। সে দিন ইঁহার সাক্ষাতে যে আনুগত্য জন্মিয়াছে তাহা আমার চিরজীবনের সহায়তা হইয়াছে। ষ্টীমার না পাওয়াতে আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেই কষ্টের মধ্যে যে তোমার অশেষ করুণা বিদ্যমান ছিল তাহা এত দিনের পরে দেখিতে পাইলাম। তুমি বিলাসপুরের রাজার সহিত আত্মীয়তা ঘটাইয়া আমার প্রচণ্ড বিপদগ্নিতে জল ঢালিয়া দিয়াছ!!

ক্ষমা

মহম্মদ মহসিন্।

একদিন নিশীথকালে মহম্মদ মহসিন্ নিজগৃহে নিদ্রিত আছেন, এক চোর আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। মহসিন্ নিদ্রাবস্থায় শীঘ্রচেতন হওয়াতে অতি সামান্য শব্দেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গৃহে চোর-প্রবেশ বুঝিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। চোর মহাবিপদে পড়িল। সে পরদিন রাজদ্বারে কতই দণ্ড পাইবে ভাবিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল। "স্ত্রীপুত্রের কষ্টে আত্মহারা হইয়া আমি পাপও করিতে বসিয়াছি, ইহা ভগবান্ সহ্য করিবেন কেন? সুতরাং তিনি আমাকে যথাযোগ্য শাস্তি দিবেন বলিয়া ধরাইয়া দিলেন। হা ভগবন্, আমি যাহাদের কষ্ট লাঘবের জন্য এই পাপ করিলাম, তাহাদের দুঃখ লাঘব দূরে থাকুক বরং বিপৎ-সাগরে ডুবাইলাম। তাহারা নিশ্চয়ই আজ একেবারে অনাথ হইল। আমার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আজ হইতে তাহারা পথের ভিখারী হইল!" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। "কিন্তু যাহার বিত্ত অপহরণ করিতে আসিয়াছি, আমার ক্রন্দন দেখিয়া তাহার দয়া হইবে কেন?" ভাবিয়া চক্ষের জল মুছিল ও কখন পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবে এই ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

মহম্মদ মহসিন্ চোরের আকার প্রকার দর্শনে বুঝিলেন চোর চৌর্য্যকার্য্যে নিশ্চয়ই নূতন ব্রতী। চৌর্য্যকার্য্যে পরিপক্ক হইলে এত অনুতপ্তবৎ দৃষ্ট হইবে কেন? তিনি চোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এরূপ দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কেন? চোর চক্ষের জলে ভাসিয়া বলিতে লাগিল, "হুজুর, আমি স্ত্রীপুত্র পালনার্থ অনেক চেষ্টা করিয়াও কাজকর্ম্মের

সুবিধা করিতে না পারিয়া এই কুকার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। অনাহারে নিপীড়িত স্ত্রীপুত্রের চক্ষের জল এমন অসহ্য হইয়াছে, যে আমি নরকে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠিত নহি। কেবল আমার নিজের জন্য হইলে এ পাপ না করিয়া অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিতাম।"

চোরের বাক্যে মহসিনের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি নিস্তব্ধভাবে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। চোর ভাবিল, আমি অরণ্যে রোদন করিলাম। যে চোর তাহার প্রতি গৃহস্থের দয়া কেন হইবে? দয়ার আশা করাই বাতুলতা। হে রজনি, তুমি আর প্রভাত হইও না। তুমি প্রভাত হইলেই আমার হাতে হাতকড়া দিয়া পথের মধ্য দিয়া সকলের সমক্ষে টানিয়া লইয়া যাইবে, যাহারা আমার আত্মীয় তাহারা স্মেরবদনে অবাক্ হইয়া বলাবলি করিবে 'অমুক লোককে ভাল জানিতাম, এ কবে চোর হইল!!' হায়! চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবার অগ্রে আমার কেন মৃত্যু হইল না?"

দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল। সূর্য্যদেব উদয়ের পূর্ব্বেই নিজ প্রভাবে সমস্ত আঁধার দূর করিতে লাগিলেন, কিন্তু চোরের মনের আঁধার যেমন তেমনি রহিল। সে আঁধার তাড়াইবার ভার সেদিন মহসিনের উপরে ন্যস্ত হইল।

মহসিন্ কম্পিতাঙ্গ চোরকে একটি গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। সে গৃহ টাকার গৃহ। চারিদিকেই টাকার থলি পড়িয়া আছে। মহসিন্ একটি টাকার থলি উন্মোচন করিলেন ও চোরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি যে দ্রব্যের জন্য আসিয়াছ তাহা সাধ পূরিয়া গ্রহণ কর।"

চোর মহসিনের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, "খোদাবন্দ, আমাকে আর লজ্জা দিবেন না। আমি যে দুষ্কার্য্য করিতে আসিয়াছি, তাহার জন্য সম্পূর্ণ অনুতপ্ত। কাটা ঘায়ে লবণ নিক্ষেপ করিবেন না।"

মহসিন্ যখন দেখিলেন, চৌর তাঁহার কথা বিদ্রূপবাক্য মনে করিতেছে তখন তিনি তাহার বস্ত্র ভূমিতে পাতিয়া তাহাতে টাকার রাশি ঢালিয়া দিলেন ও তাহা বাঁধিয়া চৌরের স্কন্ধে অর্পণ করিলেন।

এবারে চৌর ভয়ে অধীর হইয়া পড়িল, তাহার মনে হইল "এবারে মহসিন্ আমাকে বমাল সমেত গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসের হস্তে অর্পণ করিবে।" তখন সে অধীর ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "হুজুর, আমি ত আপনার কোনও দ্রব্যস্পর্শ করি নাই, আমাকে এরূপ ভাবে বমাল সমেত পুলিসের হাতে দিলে আমায় পাঁচ বৎসর কারাগারে পচিতে হইবে। এবারে বুঝিলাম, "কোথায় স্ত্রীপুত্রের প্রাণ বাঁচাইব, তাহা না করিতে পারিয়া তাহাদের প্রাণ ধ্বংস করিতে বসিয়াছি !!"

চৌরের ক্রন্দনে মহসিনের চক্ষে জল আসিল। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভদ্র, তুমি ভীত হইও না। তুমি যে চৌরকার্য্যে নূতন ব্রতী তাহা তোমার আকার প্রকারে বুঝিতে পারা গিয়াছে। আমি তোমার সহিত পরিহাস করিতেছি না। তোমাকে অনুতপ্ত দেখিয়া ভগবান্ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন ও সেই জন্য তাঁহার এই সেবককে এই অনুমতি করিয়াছেন, মহসিন্, তুমি অনুতপ্তের সেবা কর। আমি তাঁহারই আদেশে তোমার স্কন্ধে, বহুল অর্থ বাধিয়া দিয়াছি। তোমার যতদিন কর্ম্মকাজ না জুটিবে ততদিন তোমার স্ত্রীপুত্রদিগকে রক্ষা করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। অতএব তুমি নিরুদ্বেগে এই অর্থরাশি লইয়া তোমার স্ত্রীকে গিয়া বল "ভগবান্ আমার সমুদয় পাপরাশি ক্ষমা করিয়া আমাকে কি দিয়াছেন দেখ।"

চৌর মহসিনের এই বাক্যে আর অপ্রত্যয় করিতে পারিল না। সে অনুপম হর্ষের সহিত মহসিনের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তাহার নেত্র হইতে অবিরল ধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। সে নিষ্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিল, মুখে কথা সরিল না। কিয়ৎক্ষ
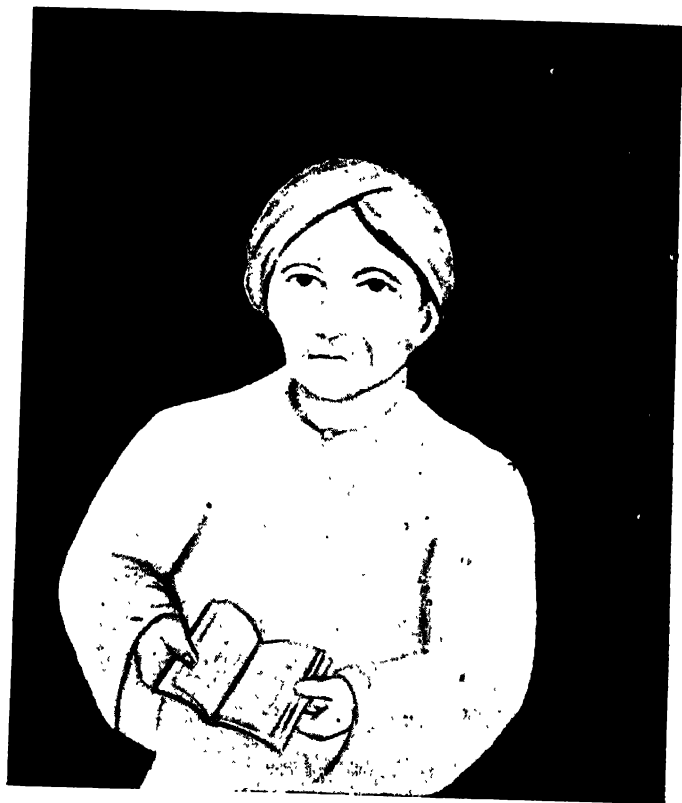
হাজি মহম্মদ মহসিন্।

পরে মহাহর্ষের প্রথম আবেগ প্রশমিত হইলে, সে মহসিনের চরণে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "দেব, আপনি কি, আর আমি কি? আপনি সাক্ষাৎ দেবতা, আর আমি নরকের কীট। আপনি যে কেবল আমার স্ত্রীপুত্রের প্রাণ বাঁচাইলেন তাহা নহে এই নরককীটের সমস্ত পাপ ক্ষালন করিয়া সৎপথে দণ্ডায়মান করাইলেন। আপনার দয়ার স্রোতে পড়িয়া আমার সমস্ত পাপ কোথায় ভাসিয়া গেল! আমার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে, যে আমার পাপ কাটিয়া গিয়াছে। পাপ না কাটিলে আমার মনে এত হর্ষ উপস্থিত হইবে কেন? আমি আজ দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিব যে, মহাত্মা মহসিনের দয়ায় অথবা ভগবানের অতুল কৃপায় আমার মনের সমস্ত পাপ পলাইয়াছে।"

চোর সে দিন হইতে এমন সরল সাধু হইল, যে কোন গোষ্ঠীতে মহসিনের কথা উঠিলে সে বলিয়া ফেলিত, "মহসিন্ আমার চৌর্য্যবৃত্তি তাড়াইয়া আমাকে সাধু করিয়াছে।" মহসিনের প্রতি তাহার এত কৃতজ্ঞতা হইয়াছিল, যে প্রকাশ্যভাবে সকলের সম্মুখে পূর্ব্বাচরিত আত্মদোষ বর্ণন করিতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত হইত না।

পরলোক অমৃতধাম।

সংসারে যত প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা আছে, তাহার মধ্যে শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে রোগের যাতনা ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে পাপের যন্ত্রণার ন্যায় কষ্ট আর নাই। কিন্তু রোগের যাতনা লোকে এই ভাবিয়া সহ্য করে, যে ঔষধাদি প্রয়োগে বা সময়ক্ষেপে ইহার উপশম হইতেই হইবে। পাপের যাতনা ভগবান্‌কে অনুতপ্তহৃদয়ে ডাকিয়া প্রশমন করে।

মানুষের অসহ্য আর একটি যে মানসিক যাতনা আছে তাহার নাম বিরহযাতনা। এই যাতনায় মানুষ পাগল হইয়া যায়, আত্মহত্যা করে, চিরজীবনের জন্য সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দেয়। হটুগঞ্জ বিদ্যালয়ের চারিপার্শে একটী স্ত্রীলোক ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার হাতে কিছু খাবার থাকিত, সেই খাবার লইয়া বিদ্যালয়ের আট দশ বৎসর বয়স্ক যে বালককেই দেখিত তাহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিত, "আয় বাবা আয়, এই তোর জন্য খাবার আনিয়াছি, কতক্ষণ কিছু খাস নাই, তোর বড়ই ক্ষিদে পেয়েছে বুঝিতেছি।" জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারা গেল, ইঁহার একটী অষ্টমবর্ষীয়া পুত্র বিদ্যালয়ে পড়িত, তাহার মৃত্যু হওয়াতে জননী উন্মাদিনী হইয়াছেন। পশ্চিম প্রদেশে একটী বঙ্গবাসী কর্ম্ম করিতেন। তিনি নিজের বাসায় পত্নীকে লইয়া যান। তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মে। যখন পুত্র দুইটীর বয়স যথাক্রমে তিন ও এক বৎসর, তখন উক্ত যুবক সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবনলীলা শেষ করেন। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ তাঁহার সৎকারার্থ তাঁহার মৃতদেহ লইয়া বাহির হইল, পত্নীও ছেলে দুইটীকে ঘুম পাড়াইয়া পাতকূয়ায় ঝাঁপ দিল। বন্ধুবান্ধবগণ সৎকারান্তে ফিরিয়া আসিয়া যখন মৃতবন্ধুর পত্নীকে খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার

মৃতদেহ কূপের জলে ভাসিতেছে। বিরহ যাতনা তাঁহার এমন তীব্র বোধ হইয়াছিল, যে তিনি সন্তান দুইটীর কি দশা হইবে তাহা একবারও মনে আনিতে পারিলেন না।

বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাপক যোগেন্দ্রনাথ বসুর বিয়োগে তাঁহার বিধবা রমণী, আর "এ পোড়া পেটে অন্ন দিব না, আর শয্যায় শয়ন করিব না" বলিয়া অন্ন ও শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অন্ন ত্যাগ করিয়া যৎসামান্য ফলমূলমাত্র গ্রহণ করিয়া ও ভূমিতে শয়ন করিয়া চিরদিনের জন্য সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

বস্তুতঃ বিরহযন্ত্রণার ন্যায় যন্ত্রণা আর নাই। এ যাতনার কাছে শরীরের অগ্নিদাহ যন্ত্রণাও যৎসামান্য। ২৪ পরগণা কোদালিয়া গ্রামে আশুতোষ বসু ও তাঁহার পুত্রের বিয়োগে তাঁহার পত্নী আপনাকে মহা পাপীয়সী ভাবিয়া "আমার তুষানলে দগ্ধ হওয়া উচিত" চিন্তা করিয়া এক রজনীতে নির্জ্জন স্থানে বসিলেন ও সমস্ত অঙ্গে কেরোসিন্ তৈল মাখাইলেন। পরে স্বামী ও পুত্রের দুইখানি সম্মুখস্থিত চিত্রে দুইখানি হাত রাখিয়া দেহে আগুন ধরাইয়া দিলেন। আত্মহত্যা যে মহাপাপ তাহা তিনি একবারও ভাবিলেন না। সমুদায় দেহ দাউ দাউ করিয়া পুড়িতে লাগিল; তিনি সামান্য চীৎকারও করিলেন না, একটু নড়িলেনও না। প্রভাতে আত্মীয়স্বজনগণ দেখিলেন, আশুতোষের পত্নীর দগ্ধ মৃতদেহ স্বামী ও পুত্রের দুইখানি চিত্রে দুইখানি হস্ত রাখিয়া বসিয়া আছেন, প্রাণবায়ু উড়িয়া গিয়াছে।

এইরূপ অসহ্য বিরহ যাতনার হাত এড়াইবার উপায় কি? ইহার একমাত্র উপায় পরলোককে অমৃতধাম বলিয়া বিশ্বাস করা।

১। ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের দৌহিত্র নবযুবক অক্ষয়কুমারকে সংস্কৃতবিদ্যায় এম্, এ উপাধি ধারণ করিতে দেখিয়া তাহার অনাথা জননী ও বালিকা বধূ কতই আনন্দ লাভ করিলেন। যাঁহার আশায় তাঁহারা

এতদিন বুক বাঁধিয়াছিলেন, তিনি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। পরলোক প্রস্থান করিবার সময়ে যখন অক্ষয়কুমার মাতা ও বালিকা পত্নীকে অধীরভাবে কাঁদিতে দেখিলেন, তখন তিনি গীতা প্রভৃতির কয়েকটী শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, তোমরা আমার জন্য কাঁদিতেছ কেন? এই সব শ্লোকেত জানিতে পারিলে, মানুষ মরে না। আমি ত মরিতেছি না, আমি পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া অমৃতধামে যাইতেছি। মা, আমার জন্য আনন্দ প্রকাশ কর। তুমি যখন আনন্দ ধামে যাইবে তখন আবার আমাকে কোলে লইয়া বসিবে।"

২। বাবু রাজনারায়ণ বসু নানা সদ্গুণের আকর অতীব মেধাবী তাঁহার একটী দৌহিত্রকে বড়ই ভাল বাসিতেন। রাজনারায়ণ বাবু যখন বৃদ্ধবয়সে সাংঘাতিক পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন, তখন ঐ দৌহিত্রের মৃত্যু হয়। পাছে রাজনারায়ণ বাবুর পীড়ার বৃদ্ধি হয় সেই ভয়ে এই দারুণ সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইল না। শেষে যখন রাজনারায়ণ বাবুর মৃত্যুর দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন তিনি একদিন দৌহিত্রকে দেখিতে চাহিলেন। এতদিন "দৌহিত্র আমার নিকট আসে না কেন?" জিজ্ঞাসা করাতে আত্মীয়গণ বলিতেন, সে পীড়িত হইয়া আপনার নিকট আসিতে পারিতেছে না। এক্ষণে দৌহিত্রদর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া রাজনারায়ণ বাবু বলিলেন, "যদি দৌহিত্র আমার নিকট না আসিতে পারে, তবে আমার এই খাটখানি ধরাধরি করিয়া তাহার নিকট লইয়া যাও, আমি একবার তাহাকে দেখিব।" এই বাক্যে আত্মীয়গণ দারুণ সংবাদ আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। ভয়ে ভয়ে অস্ফুটস্বরে দৌহিত্রের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাজনারায়ণ বাবু এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, "আমাকে এ শুভসংবাদ দেও নাই? আমার দৌহিত্র অমৃতধামে গিয়াছে? আঃ, আমি এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব!! মানুষ যতক্ষণ পৃথিবীতে থাকে ততক্ষণই

রাজনারায়ণ বসু

তাহার জন্য ভাবনা, সে অমৃতধামে জগন্মাতার নিকট যাইলে তাহার জন্য দুঃখ আসিবে কেন? আনন্দের স্থানে দুঃখ করা নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য।"

উপসংহার।

অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত, মানুষ পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া যখন পরলোক গমন করে তখন কেবল আত্মকৃত পাপপুণ্যই তাহার অনুসরণ করে। তাহার পরলোক গমনানন্তর প্রথমে পাপের শাস্তি লইয়া আপনাকে নির্ম্মল করিতে হয় ও পরে স্বর্গে গিয়া পুণ্যের ফল উপভোগ কা... হয়। পুণ্যফল ভোগ শেষ হইলেই নক্ষত্রপতনের ন্যায় তাহাকে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে পড়িতে হয়।

অতএব উক্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের মতানুসারে নবজাত শিশুমাত্রই স্বর্গীয় জীব। সে স্বর্গ হইতেই পৃথিবীতে পদার্পণ করে। শিশুর কি রূপ কি গুণ, সমস্তই সকলের এমন বিমোহনকারী যে, শিশুকে স্বর্গীয় রত্ন না বলিয়া থাকা যায় না। স্বর্গ হইতে নূতন আগমন করাতে শিশু সম্পূর্ণ নিষ্কপট। খলতা কাহাকে বলে সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহাকে আদর করিয়া কোলে লইতে যাও, যদি ভাল না লাগে, সে তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করিবে, ইহাতে সম্পূর্ণ অভদ্রতা প্রকাশ পাইলেও শিশু তাহা অনায়াসেই করিয়া ফেলে। যে জিনিসটী তাহার ভাল লাগিবে সে পদার্থ যাহারই হউক সে চাহিয়া লইতে ও বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবার নয়। সে আত্মপর বুঝে না। তাহার সহিত যে ব্যক্তি কলহ করিল, যে প্রহার করিল, তাহার প্রতি শিশু ক্রোধ করিল বটে, কিন্তু সে ক্রোধ স্থায়ী হইবার নয়। তাহার জিঘাংসা বৃত্তি দুই পলও স্থায়ী হইতে পারে না। যে তাহার প্রতি অত্যন্ত শত্রুতাচরণ করিল পরক্ষণেই শিশু তাহার গলা জড়াইয়া নিষ্কপটে ভালবাসা দেখাইল। শিশুর যেমন এই

সকল স্বর্গীয় গুণ, তাহার সেই প্রকার স্বর্গীয় রূপ, তাহার সেই প্রকার স্বর্গীয় ভাষা, তাহার সেইরূপ স্বর্গীয় আচরণ। যে বাড়ীতে একটী শিশু আছে সে বাড়ী সর্ব্বদাই আনন্দে মাতিয়া আছে। শিশুর প্রত্যেক কথা প্রত্যেক হাব ভাব বাটীর সকলকেই মাতাইয়া রাখে। যে বাটীতে সকলকেই সর্ব্বদা হাসিতে শুনা যায়, সন্ধান লইলে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের শাশ্বতিক হাস্য একটী ক্ষুদ্র শিশুর উপর নির্ভর করিতেছে। যে গৃহে শিশু নাই, সে গৃহে তেমন হাস্যও নাই, তেমন আনন্দও নাই। কেনই বা থাকিবে? আনন্দ পদার্থই যখন স্বর্গীয় ধন, তখন গৃহে স্বর্গ হইতে নূতন আগত শিশুর আশ্রয় না পাইলে সে আনন্দ কিসে পরিপুষ্ট হইবে? স্বর্গীয় ব্যক্তিই স্বর্গীয় ধনের পরিপোষণ যেমন করিতে পারিবে, তেমন কি আর কেহ করিতে পারে?

সেই স্বর্গীয় রত্ন শিশু ক্রমে যতই পৃথিবীতে বাস করিতে লাগিল, যতই পার্থিব পদার্থের পরিচয় পাইতে লাগিল, ততই তাহার স্বর্গীয় ভাব পার্থিব ভাবের সহিত জড়িত হইতে লাগিল। ক্রমে এমনও দেখা যায় যে সেই শিশু এমন পার্থিব কলুষতায় আচ্ছন্ন হইল যে, তাহাতে যে এককালে কোনও দেবভাবের বিকাশ ছিল তাহা আর বিশ্বাস হয় না।

শিশুকে বয়োবৃদ্ধির সহিত পার্থিব ভাবে দীক্ষিত হইতে ও স্বর্গীয় ভাব বিসর্জ্জন দিতে প্রথম প্রথম বহু কষ্ট পাইতে হয়। যখন একটী বালক সঙ্গীর দোষে তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিতে শিখে, তখন তাহাকে প্রথমে কষ্ট পাইতে হয়। তাহার গা ঘুরিতে থাকে, তাহার বমন হয়, তাহার যন্ত্রণা হয়। স্বর্গীয় বালকের স্বর্গের ধাতে পার্থিব ভাব সহ্য হইবে কেন? এই কালে যাহার পার্থিব ভাব অসহ্য হইল, সে স্বর্গীয় ভাব বজায় রাখিতে পারিল, যাহার অসহ্য হইল না, সে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে করিতে পার্থিব ভাবের দাস হইল, স্বর্গীয় ভাব অন্তরিত হইয়া গেল।

শিশুর স্বর্গীয় দেহে পার্থিব কলুষতা মিশ্রিত করিতে যেমন তাহাকে

ক্লেশ অনুভব করিতে হয়, স্বর্গীয় চিত্তে দুষ্প্রবৃত্তিরূপ পার্থিব ভাব আনয়ন করিতে সেইরূপ কষ্ট পাইতে হয়। শিশুকে অনেক জপাইয়া মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু প্রয়োজন সময়ে তাঁহার মুখ দিয়া হঠাৎ সত্য বাহির হইয়া যাইল। রাজপুরুষগণ এই জন্যই ঘটনার তথ্য জানিতে ইচ্ছুক হইলে বালকদিগকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। প্রতারণাদি শিখিতেও তাহাকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হয়।

একদিন কলিকাতায় শ্যামপুকুরে হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাটীতে একটী বালক জগদ্ধাত্রীর পূজার দিন প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া ছিল। সন্ধ্যার সময় অনেকে প্রণামী দিয়া প্রতিমার সম্মুখে গড় করিয়া যাইতেছিল। এক ব্যক্তি একটা সিকি প্রণামী দিয়া চলিয়া গেলে সেই সিকিটী গড়াইয়া বালকের পায়ের নিকট আসিয়া পড়িল। বালকও তাহা লইয়া আপন বস্ত্রপ্রান্তে বাঁধিল ও নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। অতঃপর হারাণচন্দ্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "অমুক ব্যক্তি যে প্রণাম করিয়া গেল, সে কি কিছু দিয়া গেল?" হারাণচন্দ্রেব পিতা উত্তর করিলেন, 'সে ব্যক্তি ত কখনই কিছু দেয় না, তবে এবারে কেন দিবে?" এই বাক্যে হারাণচন্দ্র যখন ফিরিয়া বাটীর ভিতর যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন সেই বালক আর থাকিতে পারিল না। তাহার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল "এই যে একটা সিকি দিয়া গেল?" এই বলিয়া স্বর্গের বালক সিকিটী বস্ত্র হইতে খুলিয়া দিতে একবিন্দুও লজ্জা বোধ করিল না।

মানুষ স্বর্গ হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহার স্বর্গীয় ভাব অন্তরিত হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় না। সময়ে সময়ে সেই স্বর্গীয় ভাব পার্থিবভাব ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে ও তদাশ্রিত মানুষকে পুনরায় দেবত্বে আনিয়া ফেলে।

ভূতনাথ সরকার নামে একটী যুবক কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুর গ্রামে বাস করিতেন। তিনি মহাপ্রতাপান্বিত এক জমিদারের পুত্র। বাবু

উমেশচন্দ্র দত্ত যখন হরিনাভি ইংরাজি সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন, তখন ভূতনাথ তথায় অধ্যয়ন করিতেন। ভূতনাথ সকল বিষয়েই একটী রত্ন ছিলেন। সেইজন্য বাবু উমেশচন্দ্র তাঁহাকে অত্যন্ত আদর করিতেন। বাবু উমেশচন্দ্র হরিনাভি বিদ্যালয় ছাড়িয়া কোন্নগর বিদ্যালয়ে ও শেষে সিটি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। সুতরাং ভূতনাথের সহিত তাঁহার বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই। এই সময়ে ভূতনাথ কুসংসর্গে পড়িয়া নানা দোষ শিক্ষা করেন। অন্যান্য দোষের সহিত তাঁহার মত্ততা দোষ জন্মিল। সর্ব্বপ্রকার মাদকদ্রব্যসেবনে পটু হইয়া পড়িলেন।

একদিন কোন কারণে বাবু উমেশচন্দ্রের সহিত ভূতনাথের সাক্ষাৎ হইল। বাবু উমেশচন্দ্র ভূতনাথের পতনের সংবাদ পাইয়াছিলেন। সুতরাং সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ভূতনাথকে কোমলভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস ভূতনাথ, তুমি নাকি কি এক রকম হইয়াছ? অদ্য আমি বড় ব্যস্ত আছি, একদিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

উমেশ বাবুর দর্শনে ও মৃদু মধুর ভাষণে ভূতনাথের যেন চট্‌কা ভাঙ্গিল। তিনি যে এক সময়ে স্বর্গীয় পুতুল ছিলেন, এক্ষণে নরককীট হইয়াছেন তাহা যেন তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইল। বিদ্যুৎ মেঘ মধ্যে যতই লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করুক না, অন্য বিদ্যুতের আবির্ভাবে তাহারও যেমন সহসা বিকাশ হইয়া পড়ে, সেইরূপ ভূতনাথের চিত্তে লুক্কায়িত স্বর্গীয় বিদ্যুৎ একেবারে আলোকপুঞ্জের সহিত তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইল। ভূতনাথ সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত অভ্যস্ত দোষ পরিত্যাগ করিয়া আবার স্বর্গীয় দেহ, স্বর্গীয় ভাব সমস্ত লাভ করিলেন। নিঃস্বার্থতা, সত্যপ্রিয়তা, সরলতা, অকিঞ্চনভাব সমস্ত যেন তাঁহার ফিরিয়া আসিল। তাঁহার জমিদার পিতা পুত্রকে পরম ধার্ম্মিক হইতে দেখিয়া বিষয়-রক্ষাসম্বন্ধে প্রমাদ গণনা করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার উপরে যত বিশ্বাস ছিল তেমন আর কাহারও উপর ছিল না।

ভূতনাথ স্বর্গীয়ভাবে পুনরুদ্দীপিত হইয়া হরিনাভি দাতব্য ঔষধালয়ের ভার নিজহস্তে বহন করিতে লাগিলেন। দরিদ্র ছাত্রদের বিদ্যালয়ে বেতনের জন্য নিজে সাধ্যানুসারে দান করিয়া দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। একটী স্বর্গের রত্ন যে স্থানে থাকে সেইখানে বহু স্বর্গীয় রত্নের আবির্ভাব হয়। হারাণচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বহুরত্নের একত্র সমাবেশ হইয়া উঠিল। ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন বন্ধুর তিন বৎসরের একটী বালক জ্বরের প্রকোপে অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছে শুনিয়া ভূতনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই রোগী শিশুকে কোলে করিয়া শুশ্রূষা করিতে বসিলেন, এবং যতক্ষণ তাহার চৈতন্য সম্পাদন না হইল, ততক্ষণ তাহার উপায় বিধান করিতে লাগিলেন। দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ভারগ্রহণ করাতে চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁহার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিল, ও তৎপ্রভাবে অনেকের আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য বিধান করিতে লাগিলেন।

রত্ন যতই মলিন অবস্থায় থাকুক না, তাহার রত্নত্ব যায় না। তাহাকে মাজিয়া ঘসিয়া লইলেই সে সমুজ্জ্বল হইবে। মনুষ্য সেইরূপ যতই মলিনাবস্থায় পতিত থাকুক না, তাহাকে মাজিয়া লইলেই সে আবার স্বর্গীয় রত্ন। সেই জন্য মানুষ বিগড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইতে নাই। রত্নকে মাজিতে হইলে শাণ যন্ত্রের প্রয়োজন। মনুষ্যরত্ন মাজিবার শাণ বিপদ্‌ বা সাধু পুরুষের সংসর্গ বা উদাহরণ। কুকাজ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া বিপদে পড়িয়া অনেকে দোষমলিনতা ত্যাগ করে; অনেকে সাধুদিগের সংসর্গে পড়িয়া বা তাহাদের আচরণ দেখিয়া গুণাকৃষ্ট হইয়া মালিন্য ত্যাগ করে। কিন্তু সাধুর সংসর্গ সকল সময়ে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সেই জন্য জাতীয় সাধুদিগের আচরণ নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সমাবেশিত হইল। যাহাতে এই সমস্ত সাধু বিষয় বালকদিগের চিত্তে প্রতিফলিত হয় সে বিষয়ে পিতা

মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয়বর্গ ও শিক্ষক মহোদয়গণকে একটু দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের ন্যায় যত ঘটনা তাঁহাদের চক্ষে পড়িবে সমস্ত তাহাদের চিত্তে অঙ্কিত করিতে পারিলে সে যদি দোষসমাশ্রিতও থাকে তথাপি তাহাকে মলিনত্ব বিদূরিত করিয়া স্বর্গের বিদ্যুতের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন হইতেই হইবে। তাহাকে আর পার্থিব ধূলায় বিকৃতাঙ্গ হইয়া থাকিতে হইবে না। সে দেবসহজ মান-সম্ভ্রম, আদর-অভ্যর্থনা, ভক্তি যত্ন সমস্তেরই অধিকারী হইয়া এই মর্ত্ত্য জগতেই স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে।